চোরাপথ

নজরুল ইসলাম

—: প্রাপ্তিস্থান :—
কামিনী প্রকাশালয়
১১৫, অখিল মিস্ত্রি লেন,
কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীশ্যামাপদ সরকার
১১৫, অখিল মিস্ত্রী লেন,
কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
মাঘ—১৩৬৯

মুদ্রক। শ্রীপ্রাণকুমার মুখার্জী
এস্‌ অ্যাণ্টনি এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
৯১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

চোরাপথ

তাড়াতাড়ি করে পোশাক পরছিল। প্যান্টের মধ্যে শার্টটা গুঁজে বোতাম লাগাচ্ছিল। ফোনটা বিশ্রিভাবে বেজে উঠল। একদম অফিস যাওয়ার সময়,...লোকের যদি একটুও কাণ্ডজ্ঞান থাকে! বেল্টটা লাগাতে লাগাতে মসলেম বাঁ-হাত দিয়ে ফোন তুলে কানে লাগাল। কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কে বলছেন?' ওপার থেকে খুবই মিষ্টি একটি মহিলা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'আমি? আমি, আমার নাম মহুয়া রহমান। আমি আপনার জেলার মেয়ে।'

'জেলায় বাড়ি কোথায়?'

'ঐ যে সালারের কাছে লক্ষ্মণপুর আছে না, ঐ গ্রামে। আমার বাবা আলি হোসেন চৌধুরি ওখানকার হাইস্কুলের হেডমাস্টার।'

'আপনি ওখান থেকে ফোন করছেন?'

'না, আমি এখন কলকাতায় থাকি।'

'এখানে কি করেন?'

'আমি কিছু করি না, এখানে আমার বিয়ে হয়েছে।'

'আচ্ছা আচ্ছা, স্বামী কি করেন?'

'স্টেট ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট্যান্ট।'

'খুব ভাল। এখন বলুন, কি জন্য ফোন করছেন?'

'বিচিত্রায় আপনার ওপর লেখাটা পড়ে আলাপ করতে খুব ইচ্ছে হল। কিন্তু আমি তো আপনার টেলিফোন নম্বর জানি নে। পাশের বাড়ির সেনগুপ্ত আঙ্কেলকে বলতে উনি ডাইরেকটরি থেকে বের করে দিলেন। অনেকবার ফোন করেছি। আপনাকে পাওয়াই যায় না। আচ্ছা, আমি গেলে আপনি দেখা করবেন?'

'কেন নয়? আমার সঙ্গে যারা দেখা করতে আসে একেবারে অসম্ভব না হলে আমি সকলের সঙ্গেই দেখা করি।'

'কোথায় যেতে হবে?'

'অফিসে।'

'আপনার অফিসটা তো এয়ারপোর্টে, কখন যেতে হবে?'

'যে কোন সময়ই আসতে পারেন। তবে সকাল সাড়ে দশটা-এগারটার সময়টা আমি একটু ফ্রি থাকি। তখনও অনেকেই এসে পৌঁছায় না। ফলে কাজের চাপ কম থাকে।'

'তা হলে আমি...'

কথার মাঝেই কলিং বেল বেজে উঠল। দরজা খোলার শব্দ হল। কাজের মেয়ে কমলা দরজার পর্দা সরিয়ে বলল, 'দাদা, গাড়ি এসেছে।' টেলিফোনের ওপর হাত চাপা দিয়ে কমলাকে বলল, 'ব্যাগটা দিয়ে দে।' হাতটা সরিয়ে নিয়ে মহুয়াকে বলল, 'আজ আমাকে এক্ষুনি রওনা হতে হবে। অফিসে আসুন তখন কথা হবে।' মসলেম ফোনটা নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি বেল্ট বাঁধতে লাগল।

টুপিটা মাথায় চড়াতে যাচ্ছিল, মীনা এসে বলল, 'কি দাদা, "দেশেরও লোকো আছি"? তা কখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট হল?'

'শুনলে তো। এখনও হয়নি। হলে তোমাকে বলব।'

'নাও বলতে পারেন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট তো অফিসে হল। দিদি বাড়িতে নেই। এই সময় মহিলারা এত ঘনঘন ফোন করছে কেন বলুন তো?'

'হ্যাঁ, এটা তো ভেবে দেখার মত বিষয়', মসলেম খুব গভীরভাবে চিন্তা করার ভান করে উত্তর দিল, 'খুব সম্ভবত মহিলারা এটা মেনে নিতে পারছে না যে, দিদির অবর্তমানে সব সময়টা শুধু দিদির বোনেরই হোক!'

'আচ্ছা! আবার আমাকে নিয়ে ইয়ার্কি হচ্ছে? দিদিকে আসতে দিন, মজা দেখাচ্ছি। যদি এই মহিলাদের কথা দিদিকে না বলে দিই!'

'সে তো অনেক দেরি, মিনু। তুমি বরং সব কিছু সবিস্তারে একটা চিঠি লিখে জানিয়ে দাও। অতে তোমার দিদি রত্নটি তাড়াতাড়ি চলেও আসতে পাবে।'

'ও, প্রাণটা একেবারে ছটফট করছে। দিদি তো যেতেই চাইছিল না। অত থাকতে পারছেন না তো পাঠালেন কেন?'

'পাঠালাম কেন? না পাঠালে "পুরুষ-রাজ নিপাত যাক", "অধিকার ফলানো চলবে না", "নারীকে সমানাধিকার দিতে হবে"—এসব স্লোগান শোনাতে না?'

'শোনানোর মত কাজ করলে শোনাব না!'

'তা হলে শ্যালিকা...'

'আবার শ্যালিকা? এরই মধ্যে ভুলে গেলেন?'

না, মসলেম ভোলেনি। মীনা তার স্ত্রী রোকেয়ার বোন। বাঁকুড়া খ্রিশ্চান কলেজ থেকে কেমিস্ট্রি অনার্স পাশ করে এসে দিদির কাছে থেকে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে বি টেক পড়ছে। দিদি ইউ জি সি-র সামার প্রোগ্রামে দিল্লি গেছে। ক্লাস চলছে বলে বোন এখানেই আছে। তার সঙ্গে মীনার সম্পর্কটা বেশ মিষ্টি। তবে শ-কারান্ত পরিচয়ে মীনার ঘোরতর আপত্তি। সে নিজে মসলেমকে দাদা বলে। মসলেমকেও বোন বলে শুধু সম্বোধন নয়, লোকের সঙ্গে পরিচয়ও করাতে হয়। মসলেম বুঝিয়ে বলেছিল, 'সম্বোধনে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু পরিচয় করানোতে অসুবিধা হচ্ছে, পরে লোকে বলবে, "শালিকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, আর জিজ্ঞেস করলে বলে বোন"। মীনা তুড়ি মেরে সে আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, 'বোনই তো!' সেই থেকে মসলেম সব সময় মনে রাখে, মীনা তার বোন। শুধু যখন মীনাকে একটু রাগিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে হয় তখন ইচ্ছে করে ভুলে যায়। মীনা চোখ পাকিয়ে ওঠে, 'আবার!' মসলেম একটা ছোট্ট স্যালুট ঠুকে বলে, 'না, আর নয়। এবার আসি।'

দুই

শেষের ক্লাসটা এস এম একেবারে নটা করে ছাড়ল। বাড়ি ফিরতেই সাড়ে নটা হয়ে গেল। ভাতটা একটু গরম করে নেওয়ার জন্য মসলেম প্রেসার কুকারটা বার্নারের ওপর চাপাচ্ছিল, বিরক্তি উদ্রেক করে ফোনটা তখনই বেজে উঠল। দিয়াশলাই আর

জ্বালানো হল না। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে ফোন ধরল, 'কে বলছেন?'

'মহুয়া বলছি। সকালে আমি ফোন করেছিলাম।'

'বলুন।'

'কাল বিকেলে আপনি বাড়ি থাকবেন? থাকলে আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনে যেতাম।'

'থাকলে খুব ভাল হত, কিন্তু আমি রাত নটার পর বাড়ি ফিরি।'

'হ্যাঁ, আপনি তো আবার সন্ধ্যাবেলায় ল পড়তে যান। আচ্ছা আপনি রবিবার দিন বাড়ি থাকেন না?'

'ডিউটি না পড়লে থাকি। তবে রবিবার আমি কারও সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখি না। একটু সময় পেলে পড়ি বা লিখি।'

'তা হলে কাল সকালে যদি আমাদের একটু সময় দেন!'

'কিন্তু সকালবেলায় তো আমি অফিসে থাকি না। আপনারা দশটার সময় আসতে পারেন, তার আগে সম্ভব নয়।'

'তা হলে অফিসেই যেতে হবে। বাড়িতে হলে খুব সুবিধা হত। আমরা আপনার খুব কাছাকাছি থাকি।'

'কোথায় থাকেন?'

'আপনি বি সি ব্লকে থাকেন তো?'

'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কি করে জানলেন?'

'ডাইরেকটরিতেই দেখলাম। আমরা এ এ ব্লকে। ঐ যে পাঞ্জাব ব্যাঙ্কটা আছে না, ঐ মোড় থেকে বাঁ-দিকে খানিকটা গেলে 'কমলিকা' বলে একটা বাড়ি আছে। ওর পাশের হলুদ রঙের তিনতলা বাড়িটার দোতলাতে আমরা থাকি।'

'হ্যাঁ, তা হলে খুব কাছে বটে।'

'সেজন্যই বলছিলাম, পাঁচ মিনিট সময় দিলে আমরা এখানেই দেখা করে নিতাম।'

'কিন্তু বাড়িতে আমি আত্মীয়-স্বজন ছাড়া আর কারও সঙ্গে দেখা করি না।'

'আমরা আপনার কাছে কোন কাজের জন্য যাচ্ছি না। আপনি আমাদের জেলার ছেলে। যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। তাই আলাপ করতে খুব ইচ্ছে করছে। বাড়িতে আমাদের দু মিনিট সময় দিলে, আশা করি, আপনার কিছু ক্ষতি হবে না। আপনার ক্ষতি হোক আমরা চাইও না।'

'ঠিক আছে। আমি সাড়ে নটার সময় অফিস বেরিয়ে যাই, আপনারা সওয়া নটার সময় আসুন। আপনাদের সঙ্গে কথা বলে আমি বেরিয়ে যাব।'

'অনেক ধন্যবাদ। কাল সকালে দেখা হচ্ছে।'

'ধন্যবাদ। ছাড়ছি।'

ফোনটা নামিয়ে রেখে মসলেম আবার রান্নাঘরে ঢুকল।

তিন

সওয়া নটার সময় ওরা আসবে, তাই তাড়াতাড়ি স্নান করে জামাকাপড় পরে মসলেম খেতে বসেছিল। কলিং বেলটা বেজে উঠল। কমলা গিয়ে দরজা খুলল। ফিরে এসে

বলল, 'মহুয়া বলে একজন মেয়ে দেখা করতে এসেছে। আপনি নাকি ফোনে আসতে বলেছেন।'

মসলেম ঘড়ির দিকে তাকাল। না, সওয়া নটা তো নয়, পৌনে নটা বাজছে। কেন যে এখানকার লোকগুলো নির্ধারিত সময় মেনে চলে না? বিরক্তিসহকারে বলল, 'বসতে বলুন। আমি খেয়ে নিয়েই যাচ্ছি।'

কমলা চলে গেল। মসলেম হাতমুখ ধুয়ে বসার ঘরে এসে দেখল, বার-তের বছরের একটি ছোট্ট মেয়ের হাত ধরে বছর তিরিশেক বয়সের একজন মহিলা বসে আছে। মসলেমকে দেখে সে উঠে দাঁড়াল। কাপড়ের ভাঁজ থেকে অনেকখানি মিষ্টি সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। দু হাত তুলে নমস্কার করে বলল, 'আমি মহুয়া।'

মহিলাকে দেখে এবং কথা শুনে মসলেমের বিরক্তি উড়ে গেল। মনে হল, মহিলা বেশ সুন্দর ও সপ্রতিভ। এ অঞ্চলের মেয়েদের তুলনায় অনেকটা লম্বা, সাড়ে পাঁচ ফুট হবে। স্বাস্থ্যবতী, কিন্তু মোটা বলা যাবে না। হাত এবং মুখের চামড়া মসৃণ। গায়ের রং উজ্জ্বল, লালাভ ফরসা। তার ওপর লালপাড় হলুদ শাড়ি পরেছে। ও কি করে জানল যে মসলেম হলুদ রং পছন্দ করে? বিচিত্রায় সাক্ষাৎকারে কি ছাপা হয়েছিল? না এটা নেহাৎই কাকতালীয়? হলুদ শাড়ির ওপর দিয়ে কালো চুল কোমর পর্যন্ত নেমে গেছে। হাতে সুন্দর সোনার কাঁকন। 'সোনার হাতে সোনার কাঁকন কে কার অলঙ্কার' বোঝা যাচ্ছে না। মুখে একটুখানি হাসির বেশ। সে হাসি দৃষ্টিপথ বেয়ে হৃদয়ে বিঁধে থাকছে। মনের তানপুরায় গুনগুন তান তুলছে। তার উজ্জ্বল শরীর থেকে যেন একটা দ্যুতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। যেন স্বপ্নের কোন এক রাজকুমারী অতি সাধারণ বসার ঘরখানি আলো করে দাঁড়িয়ে আছে। বাস্তবের রাজকুমারকে নিজের পরিচয় দিয়ে বলছে, 'আমি মহুয়া।'

মসলেম নিজেকে সামলে নিয়ে উচ্চারণ করল, 'বসুন। এটি কি আপনার মেয়ে?'

মহুয়া বসতে বসতে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ।' মেয়েকে পাশে বসিয়ে আদর করে বলল, 'মিলি, মামাকে নমস্কার কর।'

মিলি নমস্কার করতে মসলেম ওর গাল টিপে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওর নাম মিলি?'

'ভাল নাম রেহানা রহমান। বাবা রেখেছেন। কিন্তু ওর বাবা আমার ডাকনামের সঙ্গে মিলিয়ে ডাকনাম দিয়েছে "মিলি"। আমিও ঐ নামেই ডাকি।'

সামনাসামনি চেয়ারে বসে মসলেম জিজ্ঞেস করল, 'আপনার ডাক নাম কি?'

মহুয়া লজ্জায় মুখটা আনত করে আস্তে করে বলল, 'মিমি।'

'সুন্দর। কিন্তু আপনার স্বামী আসবেন বলেছিলেন না?'

'আসবে বলেছিল, কিন্তু ওদের অফিসে নাকি হাজিরার খুব কড়াকড়ি। সাড়ে নটার মধ্যে অফিসে ঢুকতেই হবে। বাসেই আধঘণ্টা লাগে। নটার মধ্যেই বাসে উঠে পড়তে হবে। বলল, তুমি আজ আলাপ করে এস। আমি পরে একদিন যাব। তাই মেয়েকে নিয়ে চলে এলাম। না হলে হয় তো আপনি পরে আর অ্যাপয়েন্টমেন্টই দেবেন না।'

'কিন্তু আপনি এত দেখা করতে চাইছেন কেন?'

'আপনি কি করে কঠিন কঠিন কাজ খুব সহজেই করে ফেলেন, জানতে ইচ্ছে করে। এয়ারপোর্টে তো অনেক দিন ধরেই যাত্রীদের ব্যাগ থেকে টাকা-পয়সা, সোনা-দানা চুরি হচ্ছিল, কেউ ধরতে পারেনি, আপনি এসে ধরে ফেললেন। কি করে ধরে ফেললেন বলুন তো? এয়ারলাইন্সের লোকেরাই যে করছে, সেটা বুঝলেন কি করে?'

'আরে এটা তো খুব সহজ ব্যাপার। যেখান থেকে চুরি হচ্ছিল সেখানে অন্য কোন লোকের যাওয়ার সুযোগই নেই। তা হলে অন্য লোক চুরি করবে কি করে?'

'তা না হয় হল, কিন্তু বমাল ধরলেন কি করে?'

'যারা ডিউটিতে থাকলে চুরি হচ্ছিল তাদের ওপর নজর রাখলাম। যাদের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হল তাদের ওপব বিশেষ লক্ষ্য রাখা হল। তাবপর চুরি হতেই বাড়ি ফেরার পথে ওদের একজনকে ধরে সার্চ করা হল। ওর কাছে চোরাই মাল পাওয়া যেতেই সব কজনকে ধরে ফেলা হল। চুরির পুরো মাল উদ্ধার হয়ে গেল।'

'উদ্ধার হয়ে গেল আর সিনেমার নায়িকার সঙ্গে আপনাব ছবি ছাপা হয়ে গেল!'

'না, সিনেমার কোন নায়িকার সঙ্গে আমার কোন ছবি ছাপা হয়নি।'

'একসঙ্গে না হোক, পাশাপাশি পৃষ্ঠায় তো ছাপা হয়েছে। আচ্ছা কাজটা যদি অত সহজ ছিল, তা হলে আপনার আগে যারা ছিল তারা করতে পারেনি কেন?'

'দেখুন, সেটা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। করতে পারেননি না করেননি, কেন কবেননি, তা আমি কি করে বলব?'

'বুঝেছি, ও ব্যাপারে আপনি কিছু বলতে চান না। আপনি তো কে এন কলেজে পড়তেন?'

'হ্যাঁ।'

'কোন সালে যেন পাশ করলেন—'

'একাশি সালে।'

'পঁচাশি সালের দিকে আই পি এস-এ জয়েন করলেন?'

'হ্যাঁ, পঁচাশি সালে।'

'কলেজে পড়ার সময় তো আপনি ডিবেট কবতেন?'

'করতাম, কিন্তু আপনি এত সব জানলেন কি করে?'

'সুপর্ণাদির কাছে আপনাব কথা শুনেছি। ওনার স্বামী আপনাদের কলেজে পড়াতেন। আপনি তো উনাদেব বাড়ি যেতেন।'

'হ্যাঁ, সুভাষবাবুব কাছে মাঝে মাঝে যেতাম।'

'আমাদের কলেজের ডি বি স্যারের সঙ্গেও তো আপনাব ভাব ছিল। বহরমপুরে গেলে তো ওনার বাড়িতেই উঠতেন!'

'এখনও উঠি। কিন্তু আপনি এত সব জানলেন কি করে? আপনি তখন কোথায় ছিলেন?'

'আমি তখন গার্লস কলেজে পড়ি। বাবা বাজনীতি করতেন। সেই সূত্র ধরে পার্টির লোকেরা আমাকে দাঁড় করিয়ে দিল। আমি জি এস হয়ে গেলাম। স্টুডেন্টস ইউনিয়নে সুপর্ণাদি, ডি বি স্যার দুজনেই টিচার-রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলেন। মিটিঙে কথা হত। একদিন ডি বি স্যাব বললেন, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন। পরেব মিটিঙে

জিজ্ঞেস করতে বললেন, সময় করে উঠতে পারল না। হায়দ্রাবাদ চলে গেল।'

মসলেমের স্মৃতিতে কথাটা খ্যাচ করে লাগল। তখন সবে আই পি এস-এ জয়েন করেছি। মুসৌরির ট্রেনিং শেষ করে নাগপুর যাওয়ার আগে বাড়ি এসেছি। বাড়ি থেকে বহরমপুর। দেবুদার সঙ্গে দেখা হতেই বিয়ের কথা তুললেন, 'এবার তো আর কোন অজুহাত দিতে পারবে না, বিয়েটা করে ফেল!'

দেবুদাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বললাম, 'কিন্তু তার জন্য তো একটা পছন্দমত মেয়ে দরকার?'

'অবশ্যই। পছন্দমত মেয়ে পেলে করবে তো? চল আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'কলেজে।'

'কলেজে আপনি এখন এই সব কারবার খুলেছেন নাকি?'

'কারবার খুলতে হবে কেন? তোমার "জাতভাই" খুব "খুব-সুরৎ" এক মহিলা আমাদের কলেজের জি এস হয়েছে। সে আবার তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়। আমি আলাপ করিয়ে দেব। তারপর বাকিটা তোমার।'

'বাকিটা কি?'

'ছাত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে নিশ্চয় আশা করব না যে, ফুলে ফুলে দুদিন মধু খেয়ে তুমি ফুরুৎ কর!'

'কিন্তু দেবুদা, মুশকিল হচ্ছে, আর কিছু তো দূরের কথা, সেই দুদিন মধু খাওয়ার সময়ও এখন নেই। এই তো আজ ট্রেনে চাপব। নাগপুরে তিন সপ্তাহের ট্রেনিং শেষ করে হায়দ্রাবাদে যেতে হবে। হায়দ্রাবাদে যে একটানা এক বছর ট্রেনিং হবে তার মধ্যে একবারও বাড়ি আসতে দেবে না। কাউকে সঙ্গেও থাকতে দেবে না।'

দেবুদা আর জোর করেননি। করলে হয় তো দেবুদার ইচ্ছেমত এই মহিলার সঙ্গেই তার বিয়ে হয়ে যেত। কিন্তু আজ এত বছর পরে মহিলা সে কথা তুলতে চাইছে কেন? বোঝার জন্য জিজ্ঞেস করল, 'তখন তো কাগজে আমার নাম বের হয়নি, তখন আমার সঙ্গে আলাপ করার আগ্রহ হল কেন?'

'হোস্টেলের একটা ঝামেলা নিয়ে থানা-পুলিস হয়েছিল। পুলিস কিছু করছিল না। সুপারের সঙ্গে এস পি অফিসে গেলাম। এস পি ছিলেন না। অ্যাডিশনাল এস পি আমাদের সামনেই থানায় ফোন করে দিলেন। আমরা হোস্টেলে ফিরে আসার আগেই থানার বড় দারোগা এসে হাজির। আমি তো গ্রামের মেয়ে, থানার বড় দারোগা আমার কাছে বিরাট ব্যাপার। সেই দারোগার এমনতর কর্তার ওপর স্বাভাবিকভাবেই খুব ভক্তি হয়েছিল। যখন ডি বি স্যারের কাছে শুনলাম যে আপনিও ওরকম কর্তা হয়েছেন তখনই আলাপ করার আগ্রহ হল।'

মহুয়া না বললেও আরও একটু ছিল। বাবা আলি হোসেন চৌধুরি মাঝে মাঝেই মেয়েকে দেখতে হোস্টেলে আসতেন। হাই স্কুলের হেডমাস্টার বলে সুপার সুপর্ণাদির সঙ্গে ভাব হয়ে গিয়েছিল। একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, 'একটি ভাল ছেলে পেলে মিমির বিয়ে দিয়ে দিতাম। পড়তে চাইলে, তারপরেও পড়ুক। পাড়াগ্রামে থাকি, খোঁজখবর তেমন পাই না। আপনার জানাশুনার মধ্যে থাকলে একটু জানাবেন।'

তারপরের দিনই মসলেমের কথা উঠতেই সুপর্ণাদি ডি বি স্যারকে বললেন, 'মসলেম তো তোর খুব ভক্ত। ভাল চাকরি পেয়েছে। এবার নিশ্চয় বিয়ে-টিয়ে করবে। তুই মহুয়ার জন্যে বল না।' মহুয়ার খুব লজ্জা করছিল, আবার ভালও লেগেছিল। কিন্তু ডি বি স্যারটা কোন কাজের নয়, বললেন, আলাপ করিয়ে দেবেন। পরের দিনই জানিয়ে দিলেন, সময় হল না। হায়দ্রাবাদ চলে গেল।

মসলেমের কথাটা বিশ্বাসযোগ্যই মনে হল। কি বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই কলিং বেল বেজে উঠল। কমলা দরজা খুলে জানাল, 'দাদা, গাড়ি এসেছে।'

'ব্যাগটা দিয়ে দে। আমি আসছি।' মসলেম উঠতে যাচ্ছিল।

মহুয়া উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে—'

'দেরি হয়নি, তবে সময় হয়েছে।'

'এই যে এখন বেরুচ্ছেন, ফিরবেন সেই সাড়ে নটায়?'

'কিছু করার নেই। অফিস থেকে ল-এর ক্লাস। ক্লাস শেষ হতেই নটা।'

'এত কাজের পরও আপনি ল পড়তে গেলেন কেন? আপনি কি চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবছেন? লইযার তো গণ্ডায় গণ্ডায় আছে। আর কোর্টের বাইরে লইযারের কি ক্ষমতা আছে? একজন পুলিস অফিসারের তবুও কিছুটা ক্ষমতা আছে!'

'না, আমি চাকরি ছাড়ার কথা একদমই ভাবছি না। আমাদের কাজে আইন জানতেই হয়। লটা পড়ে নিলে কাজে আরও সুবিধাই হবে।'

'আপনার তো একদম সময় নেই, তবুও কখনও একটু সময় করে আমাদের বাড়ি গেলে খুব ভাল লাগবে।'

'ঠিক আছে। একদিন আপনার পতিদেবতাকে নিয়ে আসুন, তারপর দেখা যাবে।'

'ওকে নিশ্চয় নিয়ে আসব', দরজার দিকে এগুতে এগুতে মহুয়া বলল, 'তবে আপনি একদিন আমাদের বাড়ি যাবেন। দেখুন, আপনাকে শুধু শুধু দেরি করিয়ে দিলাম।'

'না, ঠিক আছে।'

'যদি কিছু মনে না করেন, মাঝে মাঝে আপনাকে বিরক্ত করব।'

'আপনার কোন কাজ থাকলে বলবেন, আমি বিরক্ত হব না।'

'অনেক ধন্যবাদ। আজ তা হলে আসি।' মহুয়া হাত তুলে নমস্কার করল। মেয়ের হাত নাড়িয়ে বলল, 'মামাকে টাটা কর। টা-টা, টা-টা!'

'টা-টা।'

মসলেম দরজাটা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াতেই মিনু ধরল, 'দাদা, কটা বাজে?'

'পৌনে দশটা। কিন্তু মেমসাহেব, তুমি তো আজ কলেজ যাবে না?'

'আগে থেকে জানা থাকলে চলে যেতাম। আপনাদের মধুর মিলনে বিঘ্ন ঘটাতাম না। কিন্তু আপনি তো আগে থেকে কিছু জানিয়ে রাখেননি। তা আপনার অফিস কি আজ বিশেষ কোন কারণে দেরিতে শুরু হচ্ছে?'

'কি করব বল?'

'কমলার রান্না শেষ হতে পাঁচ মিনিট দেরি হলে কি করেন? অন্যদের কথা বাদই দিলাম। কাল সকালে সমাজ কল্যাণ সংস্থার যে মহিলা এসেছিল, তাকে

ক মিনিটে বিদায় করেছিলেন? আর এ মহিলার চামড়াটা চকচকে বলে বেমালুম জমে গেলেন!'

'মিনু, তুমি তো জান, সৌন্দর্যের প্রতি আমার একটু টান আছে। যার জন্য তোমাকে এত বেশি ভাল লাগে।'

'আবার ব্যঙ্গ? কথা ঘোরানোর চেষ্টা না করে স্বীকার করুন যে, মহিলার রূপের তাপে আপনার অস্তিত্ব কিছু নেই। গলে জল হয়ে গেছেন। এখন মহিলা ইচ্ছে করলে সে জল দিয়ে স্নান করবে, ইচ্ছে করলে থালা-বাসন মাজবে। দিদিকে এ হেন উন্নতির কথাটা জানাতেই হবে।'

'আবার দিদিকে কেন?'

'কারণ আপনি আমাব নন, দিদির সম্পত্তি।'

'সম্পত্তি?'

'সম্পত্তি কি না, সেটা দিদি আসলেই টের পাবেন। এখন দয়া করে তাড়াতাড়ি প্রস্থান করুন। না হলে আপনাব ফেউবা এক্ষুনি আবার খোঁজ নিতে আসবে।'

'জো হুকুম মহাশয়া।'

মসলেম মীনাকে স্যালুট করে বেরিয়ে গেল।

চার

টট পড়ছিল, টেলিফোনটা বেজে উঠল। আনমনে তুলে কানে লাগাতেই মিষ্টি কণ্ঠস্বর কানে এল, 'মহুয়া বলছি।'

সে স্বরে উজ্জীবিত হয়ে মসলেম চেয়ারে সোজা হয়ে বসল। বইটা টেবিলের ওপর রেখে, টেলিফোনটা ঠিক করে ধরে বলল, 'বলুন।'

'আজ তো রবিবার। আপনি বাড়িতে থাকবেন?'

'হ্যাঁ, জরুরি কোন ডাক না পড়লে আজ বাড়িতেই থাকব।'

'অন্য দিন তো সময় করতে পারেন না। আপনার খুব অসুবিধা না হলে ও কয়েক মিনিটের জন্য যেতে চাইছিল।'

'ঠিক আছে, চলে আসতে বলুন। কখন আসবেন?'

'তা হলে আমরা এখনই রওনা হয়ে যাচ্ছি। দশ-পনের মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাব।'

'চলে আসুন।'

মসলেম টেলিফোন নামিয়ে রাখল। পড়া আর হল না। অপেক্ষার মাঝে বইটা নাড়াচাড়া করতে লাগল। হয়তো মনের গোপনে একটা ইচ্ছে হচ্ছিল, ওরা এসে দেখুক, সে কত মনোযোগসহকারে পড়াশোনা করছে। কেন, কেন তা সে ঠিক জানে না।

বেল বেজে উঠল। কমলা গিয়ে দরজা খুলল। মহুয়া ওর স্বামীকে নিয়ে ঢুকল। মসলেম টেবিলের ওপর বইটা রেখে উঠে দাঁড়াল। স্বামী মহুয়াকে উদ্দেশ করে বলল, 'দেখ উনি পড়ছিলেন, আমরা এসে ডিস্টার্ব করলাম।'

'কি করব, তুমি দেখা করতে চাইছ! কাজের দিনে আসতে পারছ না, সন্ধ্যাবেলায় উনি থাকেন না। বেশি সময় নষ্ট করব না, দুয়েকটা কথা বলেই চলে যাব।'

'না না, ওরকম ভাববেন না। আপনারা এসেছেন, আমার ভালই লাগছে।'

মহুয়া আলাপ করিয়ে দিল, 'মিলির বাবা শামসুর রহমান, আর উনি মসলেম সাহেব।'

শামসুর হাত তুলে হাসিমুখে নমস্কার করল। মসলেম দেখল, মহুয়ার স্বামীও মহুয়ার মত দেখতে বেশ ভাল। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি মত লম্বা। হালকা গড়ন। সুপুরুষ চেহারা। সে প্রতি-নমস্কার করল। চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল, 'বসুন।'

দুজনে বসলে মসলেমও একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। শামসুরের দিকে তাকিয়ে আলাপ শুরু করার ভঙ্গিতে বলল, 'বলুন।'

'কাগজে তো আপনার কথা অনেক পড়েছি', শামসুর শুরু করল, 'সেদিন বিচিত্রায় দেখলাম, আপনি আমার পাশের জেলার লোক।'

'আপনাদের দেশ কোন জেলায়? নদীয়ায়?'

'না, বীরভূমে।'

'বীরভূমের কোথায়?'

'মহম্মদ বাজারে।'

'তা হলে তো শুধু পাশের জেলায় নয়, পাশের থানাও বটে। আপনি কলেজের পড়াশোনা সিউড়িতে করেছেন, না শান্তিনিকেতনে?'

'না, আমি কলকাতাতেই পড়াশোনা করেছি। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে।'

'হোস্টেলে থাকতেন?'

'না, পার্ক সার্কাসে আমাদের বাড়িতে থাকতাম।'

'আপনাদের বাড়ি মহম্মদ বাজারে বললেন না?'

'হ্যাঁ। মহম্মদ বাজারে আমাদের দেশের বাড়ি, তবে বাবা কলকাতায় চাকরি নিয়ে এলে পার্ক সার্কাসে থাকতেন। ওখানে বাড়িটা কিনেছিলেন।'

'বাবা কোথায় কাজ করতেন?'

'আপনাদেরই ডিপার্টমেন্টে। তবে উনি নীচের দিকে ছিলেন। কলকাতা পুলিসে এস আই হয়ে ঢুকেছিলেন, এ সি হয়ে রিটায়ার করেছিলেন।'

'আচ্ছা। তা হলে আপনারা এখানে যে বাড়িটায় থাকেন সেটা ভাড়াবাড়ি?'

'না।' এবার মহুয়া কথা শুরু করল, 'শ্বশুর মশাই এখানে একটা প্লট কিনে রেখেছিলেন। রিটায়ার করার পর বাড়িটা করেন। একতলা এবং তিনতলা ভাড়া দেওয়া হয়েছিল, দোতলাটা ফাঁকা ছিল, বিয়ের পর আমরা এখানে চলে এলাম।'

'তা হলে ও বাড়িটার কি হল?'

'আছে। ওখানে আমার দেওর থাকে। ও অবশ্য এখন অস্ট্রেলিয়ায় গেছে, তবে আমার শাশুড়ি আছেন। আমরাও প্রতি সপ্তাহেই যাই।'

মসলেমের মনে হল, মহুয়ার স্বামী একজন সাধারণ ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্ট্যান্ট হলেও উত্তরাধিকারসূত্রে বেশ ধনী লোক। দেশের বাড়ি ছাড়াও কলকাতায় দু-দুটো বাড়ি। নিশ্চয় সমানুপাতে ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সও আছে। সবই বাবা রেখে গেছেন। ভদ্রলোক খুব

গোছালো ছিলেন। বিয়ের সময় নিশ্চয় এগুলো বড় ধরনের বিবেচনার বিষয় ছিল। না হলে...

মসলেম আনমনা হয়ে পড়েছিল। তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য মহুয়া নিম্নস্বরে বলল, 'অত কি ভাবছেন?' মসলেম কিছু বলার আগেই মিষ্টি নিয়ে এসে টেবিলের ওপর রাখল। শামসুর আপত্তি করে উঠল, 'এ সব আবার কেন করছেন?'

মহুয়া বলল, 'আমি কিন্তু মিষ্টিটা খাব না। নিমকি-সিঙ্গাড়া খেয়ে নিচ্ছি।'

'কেন?' ঠোঁটের কোণে হাসির রেশ টেনে মসলেম জিজ্ঞেস করল, 'মোটা হয়ে যাবেন?'

'হব আবার কি, দেখছেন তো, মোটা তো হয়েই গেছি।'

'অবশ্যই দেখছি। তবে আপনাকে কিছুতেই মোটা বলা যায় না। খুব জোর বলা যায়, আপনার স্বাস্থ্যটা একটু ভাল!'

'দেখছ?' মহুয়া শামসুরকে উদ্দেশ করে বলল, 'বিশ্রি কথাটাও বলার কায়দায় কেমন সুন্দর হয়ে যায়! তুমি কায়দাটা রপ্ত করে নাও।'

'তা হলে তো আমাকে এখন গল্প লেখা অভ্যাস করতে হয়।'

'ভাল কথা মনে করিয়েছ!' মহুয়া লাফিয়ে উঠল। মসলেমের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'সত্যি করে বলুন তো, বানিয়ে বানিয়ে ওরকম সুন্দর গল্প আপনি লেখেন কি করে?'

'বলব, তার আগে এগুলো একটু খেয়ে নিন।'

'জোর করছেন? কিন্তু আমাদের ভাত খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। এখন এগুলো খেলে আর ভাত খেতে পাবব না।'

'ঠিক আছে, আপনাদের এগুলোর আগে ভাতই খাইয়ে দিচ্ছি।' বান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে ডাকল, 'কমলা!'

শামসুর আপত্তি করার চেষ্টা করল, 'না না, এ কি করছেন? আমি তা বলিনি!'

মসলেম সে আপত্তিকে গুরুত্ব দিল না। কমলা দরজার কাছে এসে উত্তর দিল, 'কেন?' মসলেম জানতে চাইল, 'এনাদের ভাত খাইয়ে দিতে পারবি?' কমলা ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিল। মসলেম বলল, 'তা হলে ভাতই দিয়ে দে, তারপর মিষ্টি।'

মহুয়া উল্টো অভিযোগ করল, 'আপনি কি আমাদের ডাল-ভাত খাইয়ে দিয়ে দায় মেটাতে চাইছেন? আমরা তাতে রাজি হব কেন? খেলে মাছ-মাংস, পাপড়-চাটনি, দই-মিষ্টি মিলিয়ে ভালভাবে খাব।'

'ঠিক আছে', মসলেম মহুয়াকে আশ্বস্ত করে বলল, 'আর একদিন ওরকম খাইয়ে দেব। তা হলে তো আজ খেতে আপত্তি নেই?'

এরপর আর আপত্তি করার কিছু ছিল না। কমলা খাবার দিয়ে দিল। ওদের সঙ্গে মসলেমকেও বসতে হল।

যাওয়ার আগে শামসুর বলল, 'মিমি বলছিল, আপনার এখানে মিসেসের এক বোনও থাকেন, তাঁর সঙ্গে তো আলাপ হল না?'

'হ্যাঁ, সত্যি তো।' মহুয়া উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'মীনা কোথায়?'

মসলেম জানাল, 'ও-ঘরে আছে। আমি দেখছি।' ভরসা করে বলতে পারল না আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। মীনার যা মেজাজ তাতে বলা মুশকিল।

সালোয়ার-কামিজ পরে চেয়ারের ওপর বসে টেবিলের ওপর বই রেখে মীনু মনোযোগ সহকারে থার্মোডিনামিকস পড়ছিল। মসলেম যে ঘরে ঢুকেছে সেটা যেন সে দেখতেই পায়নি এমনি ভাব করে পড়তেই থাকল। মসলেম ঘাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে ডাকল, 'মিনু!'

মীনা বইয়ের ওপর থেকে চোখ না তুলেই বলল, 'বলে ফেলুন!'

মসলেম মিনতির স্বরে অনুরোধ করল, 'একটু বাইরে চল।'

'কেন?'

'ওরা তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছে।'

'কিন্তু আমি ওদের সঙ্গে আলাপ করতে চাচ্ছিনে।'

'ওরা বাড়িতে এসে আলাপ করতে চাচ্ছে, তুমি না গেলে খারাপ দেখায় না?'

'ওরা তো আমার সঙ্গে আলাপ করতে আসেনি। আপনার সঙ্গে গল্প করতে এসেছে।'

'আমি তো তোমার কথা কিছু বলিনি। মিমির স্বামী নিজে থেকেই আলাপ করতে চাইল।'

'কিন্তু আলাপ করার যে অনেক অসুবিধা। আলাপ না হলে, আপনার অবর্তমানে এলে, দরজা থেকেই বিদায় করতে পারব। আলাপ হয়ে গেলে ডেকে বসাতে হবে, বকবক করে অযথা সময় নষ্ট হবে।'

'সেটা হবে না। আমি ব্যবস্থা করব।'

'আমার তো মনে হচ্ছে, আপনি ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। ঐ মেয়েটার মধ্যে আপনি কি দেখেছেন বলুন তো?'

'মিনু, ওরা চলে গেলে যা খুশি বলো। এখন রক্ষে কর।'

'রক্ষে তো আপনাকে দিদি এসে করবে, আমি রক্ষে করার কে? এখন চলুন, আপনার দায়কাজটা আগে সমাধা হোক।'

বুকের ওপর ওড়নাটা ঝুলিয়ে মীনা বাইরে এসে দাঁড়াল। মসলেম হাসিমুখে পরিচয় করিয়ে দিল, 'আমার বোন মীনা।'

মীনা হাত তুলে নমস্কার করল। শামসুর প্রতি-নমস্কার করে জানতে চাইল, 'আপনি এখন কি করছেন?'

তাড়াতাড়ি উত্তর দিল মসলেম, 'বি টেক পড়ছে।'

মীনা সেই অবসরে আবার ঘরে ঢুকে গেল। শামসুর এবং মহুয়া বিদায় নিল।

পাঁচ

সেদিন বিকেলবেলায়ই মহুয়ার ফোন এল। প্রতিদিনই আসতে থাকল। শনিবার দশটা নাগাদ ফোন করে মহুয়া বলল, 'আজ তো আপনার অফিস ছুটি, অন্য ডিউটিও পড়েনি, চলে আসুন না। চুটিয়ে গল্প করা যাবে!'

'আমার তো ছুটির দিনও বাড়ি থেকে বেরুলে কন্ট্রোলকে জানিয়ে রাখতে হয়, কোথায় পাওয়া যাবে। তার থেকে আপনারা চলে আসুন।'

'আমরা হবে না—মিস্টারের তো শনিবার ছুটি থাকে না, আমি একাই আসতে পারি।'

'তা হলে আগামীকাল আসুন!'

'আগামীকাল হবে না। রবিবার রবিবার আমরা পার্ক সার্কাসে যাই। আমার একার আসাতে আপনার আপত্তি আছে?'

'না না, আপত্তি থাকবে কেন, আপনি চলে আসুন।'

'আপনি তো সেই আলু-পোস্ত খাওয়াবেন। আমার এখানে কিন্তু মাংস রান্না হচ্ছে।'

'রান্না হচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু এখানেও মাংস আনা আছে। আপনি ইচ্ছে করলেই রান্না করে নিতে পারেন।'

'ঠিক আছে। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসছি।'

মহুয়া ফোন ছেড়ে দিল। মসলেমও ফোন ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। মীনার কথা মনে পড়তে একটু আশঙ্কাও হল। মীনা ততক্ষণে খেয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল। নিজের ঘরে যাওয়ার অছিলায় চোরা চোখে দেখে নিল, মীনা ঘুমিয়ে পড়েছে। মসলেম একটু স্বস্তি বোধ করল। এসে চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, দরজা ঠেলে মহুয়া ঢুকল। পরনে সেই লালপাড় হলুদ শাড়ি, কপালে টুকটুকে লাল টিপ। ঠোঁটে লিপস্টিক লাগানো। নখে নেলপালিশ। শরীরের ভাঁজে ভাঁজে সুগন্ধ ছড়ানো। টেবিলের ওপাশে এসে বসতে অনেকখানি সুগন্ধ ভুরভুর করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

মসলেম তার উপস্থিতিটা অনুভব করছিল। মহুয়া মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'কি ভাবছেন?'

'ভাবছি, একেকটা মানুষ কি করে অত সুন্দর হয়!'

'গল্প লেখায় কাজে লাগবে। কিন্তু কি করে হয় আমি জানিনে। তবে এটুকু জানি, সুন্দর হলে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়।'

'কি রকম?'

'একটু বড় হওয়ার পর থেকেই দেখছি তো, রাস্তায় বেরুলেই সবাই হাঁ করে তাকাবে। না বের হলেও বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করবে। একটু হেসে কথা বললেই প্রপোজ করবে। না করলেই মজনু হয়ে যাবে। তার দোষ বর্তাবে।'

'আপনাকে কতজন প্রপোজ করেছে?'

'সে অনেক। তবে কয়েকজনের কথা আমার এখনও মনে আছে। কদমদা স্কুলে আমার বছর দুয়েকের সিনিয়ার ছিল। ক্লাসে ফার্স্ট হত বলে বাবা খুব ভালবাসতেন। প্রায়ই বাবার কাছে আসত। আমাকে একা পেলেই ঘ্যানঘ্যান করে কানের পোকা মেরে দিত। কবীর দাদার সঙ্গে ডাক্তারি পড়ত। গরমের ছুটিতে দাদার সঙ্গে আমাদের বাড়ি গেল, ফিরেই লম্বা চিঠি। আমি যখন কলেজে পড়ি তখন ওখানে একজন যুবক এ ডি এম এসেছিল। আপনি তো জানেন, আমাদের হোস্টেলটা সার্কিট হাউসের কাছে, রোজ ফেরার সময় দেখতাম, ফুলের বাগানে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে প্রায়ই ফুল তুলে দিত। মাঝে মাঝে বলত, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

'এই বিয়ে হওয়ার পরও, ব্যাঙ্কে টাকা তুলতে গেছি. এক বয়স্ক ভদ্রলোক এসে ভিড়ে গেল। একথা-সেকথার পর তার ছেলেও যে পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা. সুন্দর-স্বাস্থ্যবান. ইঞ্জিনিয়ার তা জানিয়ে দিয়ে বাড়িতে কে কে আছে জানতে চাইল। আমি তো উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছি। বললাম, 'বাবা আর মা।' এরপর ঠিকানা বলতে হল। দুদিন পরে সে বুড়ো তার ছেলেব জন্য সম্বন্ধ নিয়ে হাজির। পরে শ্বশুরমশাই আমাকে কি বকা!

'এরকম আরও অনেক আছে। বলছি না, সুন্দর হওয়ার অনেক ঝামেলা।'

'শুধুই ঝামেলা?'

'না. তা কেন হবে? সুবিধাও অনেক আছে। সুন্দর বলে আমার সঙ্গে সবাই ভাব কবতে চাইবে. ফলে আমি যার সঙ্গে ইচ্ছে হবে তার সঙ্গে ভাব করতে পারি।'

এই কথাটা মসলেমের ভাল লাগল না। তবু মনের ভাব গোপন করে জিজ্ঞেস করল. 'এতজনেব মধ্যে রহমান সাহেবকে পছন্দ করলেন কি করে?'

'আর বলবেন না, ডাক্তারি পাশ করার পর দাদা কলকাতায় থেকে যায়। পার্ক সার্কাসে বাড়ি কেনে। মার সঙ্গে নতুন বাড়িটা দেখতে এসেছি। রহমানের বাবা দেখে থাকবেন। বাবার কাছে প্রস্তাব দিলেন। দেখেশুনে বাবাও রাজি হয়ে গেলেন। আমার বিয়ে হয়ে গেল।'

'কেন? আপনি কি রাজি ছিলেন না?'

'না. তা নয়। তবে আমি তখন দুনিযার অনেক কিছুই জানতাম না। জানলে কি হত জানি না।'

মহুয়া চুপ করে গেল। মসলেমও আর কথা বাড়াল না। কিছুক্ষণ পর মহুয়া মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'কই, আপনার কমলা কোথায়? রান্না শুরু করতে বলুন!'

'কিন্তু সে তো এতক্ষণ থাকে না। রান্না করে আমাদের খাইয়ে দিয়ে চলে গেছে। আবার বিকেলে আসবে।'

'তাহলে আমার একার জন্য রান্না করতে হবে?'

'না, আমি আপনাকে সঙ্গ দিতে পারি। কিন্তু রান্না আপনাকেই করতে হবে।'

'যান! এই কাপড়-চোপড় পরে গরমে রান্না করা যায়? আমি পারব না।'

'তা হলে সেই আলু-পোস্ত!'

'না, আমি আলু-পোস্তে নেই। বাড়িতে রান্না মাংস ছেড়ে এসেছি, আমাকে মাংসই খাওয়াতে হবে।'

'সেক্ষেত্রে রান্না করা ছাড়া কোন উপায় নেই। বড় জোব আমি আপনাকে তাতে সাহায্য করতে পারি।'

'তা হলে তাই করুন। চলুন।'

মহুয়া মসলেমকে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল। ফ্রিজ থেকে মাংস বের করে ধুলো, আলু কাটল। মসলেম মসলাটা বেটে দিল। মহুযা বার্নার জ্বালিয়ে কড়ায় মাংস চাপিযে দিল। রান্না যখন শেষ হল তখন সে ঘেমে নেয়ে একশেষ। এসে ফ্যানের নীচে বসে পড়ল। ভাতটা মসলেমই বেড়ে নিয়ে এল।

খাওয়া শেষ হতে মহুয়া বলল, 'আর পারছি না, এবার একটু বিশ্রাম নিতে হবে।'

'তা হলে আপনি একটু বিশ্রাম করে নিন। সেই অবসরে আমি বইয়ের কয়েকটা পাতা উল্টাই।'

মসলেম মহুয়াকে সঙ্গে করে নিজের শোবার ঘরে নিয়ে এল। মহুয়া মসলেমের সামনেই বিছানায় শুয়ে পড়ল। মসলেম বলল, 'তা হলে আপনি বিশ্রাম করুন। আমি পড়ার ঘরে আছি।'

'পালাচ্ছেন কেন? আমার সঙ্গে কথা বলতে কি আপনার এতই খারাপ লাগছে?'

'না না, খারাপ লাগবে কেন? কথা বললে তো আপনার বিশ্রাম হবে না। আপনি একটু ভাল করে বিশ্রাম করে নিন। তারপর গল্প করা যাবে।'

মসলেম বাইরে এসে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিস্পিউট অ্যাক্ট' পড়তে লাগল। তাতে মনের মধ্যেকার ডিস্পিউট কিছুমাত্র কমল না। বন্ধ করে 'বোনাস অ্যাক্ট' খুলল। মনে হল, মনটা বেতনের থেকে বোনাসের দিকেই বেশি ঝুঁকছে। ওটাও বন্ধ করে আলমারি থেকে জীবনানন্দ দাশের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' বের করে খুলল। কবিতা পড়ে বরং মনটা অনেকটা শান্ত হল।

সাড়ে তিনটে নাগাদ ঘর থেকে বেরিয়েই মহুয়া তাড়া লাগিয়ে দিল, 'মেয়ের ফেরার সময় হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে।'

'মেয়ের না মেয়ের বাবার ফেরার সময় হয়েছে?'

'বাবার ফেরার সময় হলে আমার বয়েই গেছে! ফিরলে অপেক্ষা করবে, কিন্তু মেয়ে ফিরে আমাকে না পেলে মন খারাপ করবে।'

'কটায় ফেরে?'

'রাস্তায় জ্যামের ওপর নির্ভর করে, পৌনে চারটে থেকে চারটের মধ্যে। আর দেরি করলে চলবে না, আপনি কিন্তু আমাদের বাড়ি একদিন যাবেন।'

'যাব।'

'সেই প্রথম দিন থেকে তো যাব যাব বলছেন, কিন্তু একদিনও গেলেন না!'

'না, একদিন যাব।'

'দেখা যাক, সেই একদিন কবে আসে! আমি চললাম।'

মহুয়া তাড়াতাড়ি দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। মসলেম এসে আবার পড়ার টেবিলে বসল। মিনিট দশেকের মধ্যেই ফোনটা বেজে উঠল। ধরতেই মহুয়া বলল, 'পৌঁছে গেছি। মেয়ের বাস এখনও আসেনি।'

'যাক, বাঁচা গেল। আশ্বস্ত করলেন।'

'তা আপনিও তো মাঝে মাঝে ফোন করতে পারেন। আমাদের পকেট থেকে পয়সা দিতে হয়। তবুও কতবার ফোন করি। আর আপনার ফোনের পয়সা সরকার দেয়। তবুও যদি একবার ফোন করেন!'

'আচ্ছা, এবার করব।'

'দেখা যাক কবে করেন! এখন ছাড়ছি।'

মহুয়া ফোন ছেড়ে দিল। দরজা ঠেলে কমলা ঢুকল। রান্নাঘরে ঢুকে চা করতে লাগল। চায়ের গন্ধে গন্ধে মীনা উঠে হাত-মুখ ধুলো। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে

তির্যকভাবে বলল, 'কি, দাদার কি এখনও মনখারাপ করছে? তা এত তাড়াতাড়ি যেতে দিলেন কেন?'

'কাকে?'

'মিমিরানি ছাড়া আরও কেউ এসেছিল নাকি?'

'তা হলে তুমি আসলে ঘুমাওনি!'

'ঘুমোতে তো চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনার কীর্তিকলাপ দেখে ঘুমোতে পারলাম কই!'

'কেন? আমি আবার কি করলাম?'

'দাদা কি বাকি রাখলেন বলুন? বাইরের একটা মেয়েকে নিয়ে গিয়ে দিদির বিছানায় তুললেন, এরপর আর কি করতে চান?'

'আরে! তুমি ওরকমভাবে দেখছ কেন? মহিলা একটু বিশ্রাম করবে বলল। তুমি এ ঘরে শুয়ে ছিলে, তাই ও-ঘরে বিশ্রাম করতে বললাম।'

'খুব ভাল করলেন। আজ ওকে নিজের বিছানায় শোয়ালেন, কাল গিয়ে আপনি ওর বিছানায় শুয়ে পড়বেন।'

'মিনু! এটা কি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?'

'আপনি করলে বাড়াবাড়ি হচ্ছে না, আমি বললেই বাড়াবাড়ি হচ্ছে ? ঠিক আছে, আমি আর কিছু বলব না।'

মীনা রাগ করে ঘরে ঢুকে গেল। মসলেম ছুটল তার রাগ ভাঙাতে।

ছয়

দিন দশেক হয়ে গেল! মসলেমও দুয়েকবার করেছে। মহুয়া প্রতিদিনই করত। কিন্তু গত তিন দিনে সে একবারও ফোন করেনি। কোন ঝামেলা হল? ফোন করলেই তো জানা যায়। ফোনটা একবার তুললও। কোন দরকার নেই, অন্য কেউ ধরলে কি বলবে? আবার নামিয়ে রাখল, আর তখনই ফোনটা বেজে উঠল। তুলতেই মহুয়ার কণ্ঠস্বর ভেসে এল। মসলেম জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার বলুন তো, কদিন কোন পাত্তা নেই!'

'শুনুন না, রহমানের শুক্রবার অপারেশান হয়েছে।'

'কিসের অপারেশান?'

'না, ভয় পাবার মত কিছু নয়। পায়েলস।'

'আগে কিছু জানাননি তো।'

'পশ্চাৎদেশের অপারেশান বলে রহমান বলতে দেয়নি।'

'এখন কেমন আছেন? তা হলে তো একবার দেখতে যেতে হয়।'

'সেই জন্যই ফোন করছি। রহমানের মা এসেছেন। আমার বাবাও। আজকে বিকেলেই চলে যাবেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। অফিস যাওয়ার সময় এলে সকলের সঙ্গেই দেখা হয়ে যাবে। আসছেন তো?'

'দেখছি।'

'তা হলে আসুন।'

মহুয়া ফোন ছেড়ে দিল। মসলেম ফোন নামিয়ে রাখতেই কলিং বেল বেজে উঠল। কমলা দরজা খুলে বলল, 'দাদা, গাড়ি এসেছে।' মসলেম ব্যাগটা নিয়ে গাড়িতে উঠল। এ সি মার্কেটের কাছে গাড়ি থামিয়ে ফল কিনল। পাঞ্জাব ব্যাঙ্কের কাছে এসে ড্রাইভারকে বলল, 'ডানদিকে। হ্যাঁ. ঐ হলুদ বাড়িটার সামনে।' গাড়ি থামতেই মসলেম সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলার দরজার বেলের সুইচ টিপল।

দরজা খুলে মহুয়া হাসিমুখে বলল. 'আসুন আসুন।'

বাচ্চা মেয়েটি মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তার হাতে ফলের ব্যাগটা ধরিয়ে দিয়ে মসলেম মহুয়ার সাথে সোজা ঘরের ভিতর ঢুকে গেল। শামসুরের কুশল জিজ্ঞেস করল। মহুয়া তার শাশুড়ি এবং বাবার সঙ্গে মসলেমের পরিচয় করিয়ে দিল। বাবা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, 'আমাদের জেলার ছেলে দেখলেই চেনা যায়। এত নাম করেছে, তবু সহজ-সরল ভাবটা আছে।'

মসলেম হাত জোড় করে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'দেখুন আমি অফিস যাওয়ার পথে এসেছি, এখনই চলে যেতে হবে, পরে কথা বলব।'

মহুয়ার বাবা বললেন. 'নিশ্চয় নিশ্চয়। কাজে ঠিক সময় যাওয়া উচিত। তুমি যাও।'

মসলেম সিঁড়ি দিয়ে নেমে গাড়িতে উঠে বসল। গাড়ি চলতে লাগল।

সাত

মসলেম অফিসে বসে ছিল। মহুয়া ফোন করে বলল, 'আসব বলে গেলেন, কিন্তু আর এলেন না তো!'

'আপনারাও তো আর আসেননি।'

'আমাদের কথা আর আপনার কথা এক হল? আমাদের তো আপনার মত গাড়ি নেই!'

'অনেক টাকা আছে তো, ইচ্ছে করলেই কিনতে পারেন। কিনে ফেলুন।'

'কিনব তো ভাবছিলাম। কিন্তু রাখব কোথায়? রাখার ব্যবস্থা করে দিন, কিনে নিচ্ছি।'

'অসুবিধাটা কোথায়?'

'এ সব কথা টেলিফোনে হয় না। একদিন আসুন, বলব।'

'ঠিক আছে। কোন কাজে আটকে না গেলে ফেরার পথে আসব।'

মসলেম ফোন রেখে দিল। ল-এর ক্লাস সেরে বাড়ি ফেরার পথে মহুয়াদের বাড়ি গেল। মসলেমকে বসিয়েই মহুয়া বলল, 'আজ রাতে এখানে খেয়ে যাবেন।'

'না, সেটা সম্ভব নয়। মীনা না খেয়ে অপেক্ষা করবে।'

'মীনাকে ফোন করে দিচ্ছি।'

'তাতে উল্টো ফল হবে। এতক্ষণ না খেয়ে বসে আছে, এখন খেয়ে নিতে বললে ক্ষেপে যাবে। তার থেকে গিয়ে একসঙ্গে খাব।'

মহুয়া আর চাপাচাপি করল না। স্বামীকে বলল, 'সমস্যাটা তুমি সংক্ষেপে বুঝিয়ে বল।'

শামসুর বলল, 'সমস্যাটা খুব সোজা, কিন্তু কঠিন। আমাদের নিচের তলার ভাড়াটে গ্যারেজটা এতদিন ব্যবহার করছে। আমরা তলাটা ভাড়া দিয়েছি, গ্যারেজটা দিইনি, কিন্তু যেহেতু আমাদের কোন গাড়ি ছিল না, ওরা ব্যবহার করছে, এখন আমরা গাড়ি কিনব ঠিক করেছি—গ্যারেজটা ছাড়তে বলছি, ছাড়ছে না। থানায় ডায়েরি করেছি, পুলিস কিছু করছে না। কোর্টে অ্যাপিল করেছি, দিনের পর দিন ডেট পড়ে যাচ্ছে।'

'গ্যারেজটা ও কতদিন ব্যবহার করছে?'

'বছর পনেব।'

'যখন প্রথম ব্যবহার করতে শুরু করে তখন আপত্তি করেছিলেন?'

'সত্যি কথা বলতে না।'

'তা হলে তো ভাড়া দেননি, প্রমাণ করা মুশকিল হবে। ও বলবে, তলার অংশ হিসেবে গ্যারেজও ভাড়া নিয়েছে।'

'ঠিক তাই বলছে।'

'কোর্টে আপনি উচ্ছেদের মামলা করেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে তো কোর্টে একটা অর্ডার না হওয়া পর্যন্ত কিছু করা মুশকিল। কোর্ট যদি উচ্ছেদের অর্ডার দেয়, একমাত্র তবে পুলিস আপনাকে সাহায্য করতে পারে।'

'কোর্টে যে কবে অর্ডার হবে কোর্টই জানে। শুনানিই হচ্ছে না।'

'কোর্টের অর্ডার-টর্ডার কিছু লাগবে না। যা ভীতু আছে, পুলিস যদি ধরে নিয়ে গিয়ে একটু টাইট দিয়ে দেয়, তা হলেই লেজ তুলে পালাবে।'

'কিন্তু কোর্টে যতক্ষণ মামলা থাকবে, কোন পুলিসই তা করতে পারবে না।'

'তা হলে আমরা কি মামলাটা তুলে নেব?'

'না না। তা হলে তো হার স্বীকার করে নেওয়া হল। উকিলকে বলে তাড়াতাড়ি একটা রায় বের করার চেষ্টা করুন।'

'রায় বের হলে গ্যারেজটা পাওয়া যাবে তো?'

'তা পাওয়া যাবে। আর বসা যাবে না, এখন আসি।'

মসলেম সিঁড়ি দিয়ে নেমে গাড়িতে উঠে বসল।

আট

বাড়িতে এসে দেখল, মীনার মেজাজ খারাপ। দরজা খুলে কোন কথা না বলেই নিজের ঘরে ঢুকে গেল। মসলেম বুঝতে পারল না। গতকাল না হয় দেরি করে ফিরেছিল, রাগ হওয়ার সঙ্গত কারণ ছিল, আজ তো শেষের পিরিওডটা হয়নি বলে অনেক আগেই চলে এসেছে। ওর কলেজে কিছু হল? তা হলে তো ব্যাপারটা মসলেমকে বলত। কিছু যখন বলছে না তখন রাগটা তারই ওপর। হাত-মুখ ধুয়ে মীনাকে খেতে ডাকল। খাওয়ার টেবিলেও কোন কথা হল না।

খাওয়া শেষ হলে মীনা বোম ফাটাল, 'আমি হোস্টেলে চলে যাব, এখানে আর থাকব না।'

'কেন?'

'লোকে ফোন করে যা-তা বলছে।'

'কোন লোকে?'

'পরিচয় দেয়নি। তবে কথা শুনে মনে হল, আপনার মিমির স্বামীটা হবে।'

'কি করে বুঝলে?'

'ঐ যে, সেদিন কিবকম জিভ উল্টে কথা বলছিল না! টেলিফোনেও ওরকম মনে হচ্ছিল।'

'কি বলছিল?'

'আপনাকে বলিনি, আগেও কয়েকবার ফোন করেছে। অন্য দিনও করে। তবে শুক্রবার বিকেলে বেশি। ফোন তুললেই জিজ্ঞেস করবে, কে বলছেন? যেমনি জিজ্ঞেস করব, আপনি কে? অমনি ফোন ছেড়ে দেবে। আজ জিজ্ঞেস করেছি, বলে কি না, তোমার বন্ধু। মেজাজ খারাপ হয় কি না! ছেড়ে দিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে আবার ফোন। বলে, একটি মেয়ে প্রায়ই আপনার দাদার বাড়ি যায়। আপনার দাদাও মেয়েটির বাড়ি যায়। বললাম, ওসব ফালতু কথা শুনতে চাইনে। বলল, শুনতে চান আর না-ই চান, এইটুকু জেনে রাখুন যে, মেয়েটির সঙ্গে আপনার দাদার অবৈধ সম্পর্ক হয়ে গেছে। বলেই লাইন কেটে দিল।'

মসলেম আর কোন কথা বলতে পারল না। মহুয়ার স্বামীটা এত ঘৃণ্য প্রকৃতির লোক! একদিকে বাড়িতে এসে আলাপ করছে, খাওয়াদাওয়া করছে, নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ করছে, অফিসে আসছে—অন্যদিকে এরকম জঘন্য কাজ করছে! মনের ক্ষোভটা মীনার কাছে প্রকাশ করে ফেলল।

মীনা নরম হয়ে বলল, 'দাদা, মহুয়া তো যখন-তখন আমাদের বাড়ি চলে আসে। ওর স্বামী হয়তো অন্য কিছু ভাবে। সহ্য করতে পারে না।'

'সহ্য করতে না পারলে নিজের স্ত্রীকে মানা করলেই তো পারে!'

'পারে। কিন্তু মহুয়াকে তো দেখেছেন, কিরকম স্মার্ট মেয়ে। আর স্বামীটা তেমনি মিনমিনে। হয়তো ভয়ে কিছু বলতে পারে না। অথবা জানে, বললে শুনবে না।'

'আমাকে বলতে পারে। অন্তত আমাদের বাড়িতে না আসতে এবং নিজের বাড়িতে আমাদেরকে না ডাকতে পারে!'

'কিন্তু তাতে যদি মহুয়ারানি রাগ করে?'

'তাই বলে এরকম নোংরামি করবে?'

'এরকম করা উচিত, আমি বলছি না। কিন্তু রাগ করার আগে লোকটার দুরবস্থার কথা একবার ভেবে দেখুন।'

মসলেম ভেবে দেখল, এরকম পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা অভিপ্রেত নয়। পরের দিন অফিসে গিয়েই মহুয়াকে ফোনে ধরল। সব শুনে মহুয়া বলল, 'এ নিশ্চয় একতলার ভাড়াটের কাজ।'

'কি করে বুঝলেন?'

'আপনি জানেন না! এই তো প্রথম না। আমাদের সঙ্গে কারও একটু ঘনিষ্ঠতা হলেই ওরকম করে। লোকাল থানায় কালাম বলে রহমানদের ওদিককার একজন অফিসার ছিল। আমাদের বাড়ি মাঝে মাঝে আসত। তা কি না থানার বড়বাবুর কাছে অমনি চিঠি দিল। দাদার বন্ধু দেবাশীষদা আসতেন, তার বাড়িতেও চিঠি গেল।'

'বুঝলাম। কিন্তু আমাকে আপনার ভাড়াটের চেনার কথা নয়। যদি চেনেও, আমি দুদিন ওখানে গিয়েছি, সেটা জানতে পারে। কিন্তু আপনি আমাদের বাড়ি এসেছেন সেটা তার জানার কথা নয়। কারণ সব কাজ কামাই করে সে নিশ্চয় আপনার পিছন পিছন ঘোরে না। ঘুরে তার কোন লাভ নেই। আমার ফোন নম্বর এবং যাওয়া-আসার ব্যাপারটা মাত্র দুজন লোক জানে। একজন আপনার স্বামী রহমান, অন্যজন মিঃ সেনগুপ্ত।'

'তা হলে এটা সেনগুপ্ত আঙ্কেলের কাজ।'

'কি করে বুঝলেন?'

'মানে, সেনগুপ্ত আঙ্কেল তো রিটায়ার্ড ম্যান। রহমান অফিস চলে গেলে প্রায় প্রতিদিনই দুপুরে গল্প করতে আসেন। আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর বেশ কদিন ওনাকে ফিরে যেতে হয়েছে। আর ঐ যে, এয়ারপোর্ট হোটেলে আপনাদের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম, বাংলা খবরে আমাকে দেখিয়েছিল তো। বলে, দেখাবেই তো। কাকে কাকে দেখাতে হবে সেটা ব্রিফ করাই থাকে। আমার মনে হয়, উনিই করেছেন।'

'আমার কিন্তু মন বলছে, আপনার স্বামীই করেছেন।'

'না না। হতেই পারে না। রহমান ওরকম লোক নয়।'

'ঠিক আছে, আমি ফোনটা অবজার্ভেশানে রাখছি। এবার ফোন এলেই প্রমাণ হয়ে যাবে, কে করছে।'

'সেই ভাল।'

মসলেম ফোন ছেড়ে দিল।

নয়

মায়ের অসুখের খবর পেয়ে মসলেমকে হঠাৎ করে বাড়ি চলে যেতে হল। সপ্তাহ খানেক পর ফিরে দেখল, মহুয়াদের প্রতি মীনার ধারণা আমূল পাল্টে গেছে। মীনা বলল, 'না দাদা, মহুয়ার স্বামীটা বোধহয় অতটা খারাপ নয়।'

'কি করে বুঝলে?'

'আপনি তো তাড়াতাড়ি করে বাড়ি চলে গেলেন। আপনি নেই তো আপনাব চেলাদেরও টিকি দেখা যায় না। সুবীরবাবু, সামাদদাও খোঁজ নেননি। কিন্তু মহুয়ারা প্রতিদিনই ফোন করত। এর মধ্যে আবার গ্যাস ফুরিয়ে গেল। গ্যাসের দোকানের টেলিফোন নম্বর ছিল। কিন্তু কয়েকশ' বার ফোন করেও পাওয়া গেল না। পরে জানা গেল, ওদের লাইনই খারাপ। কমলাও দোকানটা চেনে না। কি করি? মহুয়া শুনে ওর স্বামীকে বলল। রিকশা করে গিয়ে সিলিণ্ডার এনে দিল।'

'রবি এসেছে বললে যে?'

'ও তো কাল এসেছে।'

'কি করছে?'

'ও ঘরে সটান শুয়ে "চোখের বালি" পড়ছে।'

মসলেম শ্যালককে ঠাট্টা করে ডাকল, 'ও রবি, তোমার আবার চোখের বালি কে হল?' রবি এসে ঠোঁটে হাসির রেশ নিয়ে মুখ নিচু করে দাঁড়াল। মসলেম আবার জিজ্ঞেস করল. 'তোমার কাকে ভাল লাগছে—আশাকে না বিনোদিনীকে?'

রবি কিছু বলার আগেই দরজার বেল বেজে উঠল। রবি গিয়ে খুলল। ফিরে এসে জানাল, 'দাদা, একজন মেয়ে আপনি আছেন কি না জিজ্ঞেস কবছে।'

মসলেম গিয়ে দেখল, মহুয়া দরজায় দাঁড়িয়ে হাসছে। পাশে মিলি। মসলেমকে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'এটি আবার কে? আগে তো দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না!'

'না. দেখেননি। আমার মিষ্টি কুটুম্ব।'

'ও. তা হলে ওর নাম রবি?'

'এই তো চেনেন দেখছি!'

'হ্যাঁ. মিনুর কাছে ওর কথা অনেক শুনেছি। ওর তো আরও আগে আসাব কথা ছিল।'

'হ্যাঁ, বসুন। রবির সঙ্গে গল্প করুন। রবি আবার কোথায় গেলে?'

রবি মীনার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। মসলেম বলল, 'বস। মহুয়াদিব সঙ্গে গল্প কর। মহুয়াদি তোমাকে চেনেন। আমি ততক্ষণে মীনাকে ডেকে আনি।'

মসলেম ঘরে ঢুকতেই মীনা ফিক করে হেসে ফেলল। মসলেম জিজ্ঞেস করল. 'কি ব্যাপার?'

'ব্যাপার গুরুতর।'

'কি রকম?'

'রবিরও মহুয়াকে খুব পছন্দ হয়েছে।'

'তুমি কি করে জানলে?'

'এক্ষুনি এসেছিল না, আমাকে চুপিচুপি বলছিল।'

'ভালই তো। এখন বসে বসে গল্প করুক। তুমি যাবে না?'

'যাচ্ছি।'

মীনা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। মসলেমের সঙ্গে এসে মহুয়ার মুখোমুখি বসল। মহুয়া রবির সঙ্গে কথা বলছিল। মসলেম জিজ্ঞেস করল, 'আজ আপনার প্রোগ্রাম কি?'

'জয়াতে "ব্রেভ হার্ট" চলছে। টিকিট কেটেছি। কিন্তু কাজের মেয়েটার কাছে মেয়ে কিছুতেই থাকতে চাইছে না। আর ছবিতে এত 'হরর' আছে যে নিয়ে গেলেও ভীষণ ভয় পাবে।'

'আমাদের এখানে রেখে যান। আমার সঙ্গে দিয়ে দিন। ঘণ্টাখানেকের জন্য এয়ারপোর্ট যেতে হবে। এরোপ্লেন দেখিয়ে দেব।'

এরোপ্লেনের কথা শুনে মিলি মসলেমের সঙ্গে এয়ারপোর্ট যেতে রাজি হয়ে গেল। মহুয়া বলল. 'আপনি তো ঐদিক দিয়েই যাবেন। আপত্তি না থাকলে নামিয়ে দিন না। আমার এক দিকের ট্যাকসি খরচ বেঁচে যাবে।'

'আপত্তি কিসের? চলুন. নামিয়ে দেব।'

মা-মেয়ে দুজনেই গাড়িতে উঠল। মাকে জয়ার কাছে নামিয়ে দিয়ে মসলেম মেয়েকে নিয়ে এয়ারপোর্ট চলে গেল। নিজের কাজ সেরে, মিলিকে প্লেন দেখিয়ে বাড়ি ফিরতে দুপুর হয়ে গেল। খেয়ে মিলি ঘুমিয়ে পড়ল। সন্ধ্যানাগাদ স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে মিলিকে নিতে এল।

মহুয়া বলল, 'বইটা কিন্তু খুব ভাল। আপনার দেখা উচিত। ভাল কথা, আগামী কাল রহমানের ব্যাঙ্ক ছুটি। আমরা 'হাম আপকে হ্যায় কৌন'এর ক্যাসেট এনেছি। আপনারা যাবেন?'

'আমি এক সপ্তাহ ছিলাম না। ডাঁই কাগজ জমে আছে। আমার যাওয়া হবে না। মিনু আর রবি যাবে।'

রবি কিছু বলল না। মীনা আপত্তি করল, 'না দাদা, আমার পরের সপ্তাহেই ক্লাস-পরীক্ষা।'

'ঠিক আছে। পরীক্ষা আছে, সারা সপ্তাহ পড়ে আছে। তাছাড়া কালও সকালে খানিক পড়ে নিয়ে যাবে, আবার ফিরে এসে পড়বে।'

এত সুন্দর ব্যবস্থার পর বলার সুযোগ কমই ছিল। তার ওপর শামসুর যোগ করল, 'অত বেশি পড়লে মাথা জ্যাম হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে রিক্রিয়েশানেরও দরকার আছে।'

মীনা বেচারা আর কিছু বলতেই পারল না। মহুয়া রায় দিয়ে দিল, 'বারটার সময় তৈরি থাকবি। আমি এসে নিয়ে যাব। দুপুরের খাওয়ার পর সিনেমা দেখব।'

মহুয়া এসে নিয়ে গেল। ফিরে এসে রবি কিছুই বলল না। মীনা বিস্ময় প্রকাশ করল, 'দাদা, ঐ মহিলাকে যে আপনার কি করে ভাল লাগে জানিনে। বাড়িতে শুধুই প্রসাধনসামগ্রী আর টি ভি-ভি সি আর। না আছে বই পড়ার শখ, না আছে গান-বাজনার।'

'কি খাওয়াল?'

'অনেক কিছু। এত বেশি খাইয়েছে যে আমার একদম ভাল লাগেনি, যেন খাওয়াটাই সবকিছু।'

দশ

লয়-এর ক্লাস করছিল, কলেজের পিওন দশরথ দরজার কাছে এসে মুষ্টিবদ্ধ বাঁ-হাতটা কানের কাছে এনে বুঝিয়ে দিল ফোন এসেছে। ক্লাস থেকে বের হয়ে প্রিন্সিপ্যালের ঘরে ঢুকতে তিনি ইঙ্গিতে তুলে রাখা ফোনটা দেখিয়ে দিলেন। তুলে কানে লাগাতে ওপাশ থেকে জানাল, 'দৈনিক সংবাদ থেকে বলছি। এডিটর কথা বলবেন। একটু ধরুন।'

মসলেম ধরেছিল। এডিটর বললেন, 'মসলেম বলছ তো?'

'হ্যাঁ, কনকদা। বলুন।'

'আজ আমাদের অফিসে একটা চিঠি এসেছে। আমি পড়ে দিচ্ছি। চিঠিটা ইংরেজিতে লেখা। বাংলা করলে এরকম দাঁড়ায় :

মহাশয়,

যে অফিসারটির বিরুদ্ধে লিখতে বাধ্য হচ্ছি, আমরা তারই সঙ্গে একই বিভাগে কাজ করি এবং একই হাউসিঙে থাকি। বিভাগের সুনামের স্বার্থে আমরা এই পত্র প্রেরণ করছি।

এয়ারপোর্টের অ্যাডিশনাল এস পি মসলেম মণ্ডল ভাল পুলিস অফিসার হলেও তাব নৈতিক চরিত্র খারাপ। মিসেস রহমান নামে এ এ ব্লকের এক বিবাহিত ভদ্রমহিলার সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্কের নির্দিষ্ট প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। গত দু মাস ধরে এই সম্পর্ক চলছে। এই অবৈধ সম্পর্কের ব্যাপারে তার স্বামীও সন্দিহান। কিন্তু তার পক্ষে কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ বা তাদের হাতে-নাতে ধরা ছাড়া কোন কিছু করা অত্যন্ত ডেলিকেট ব্যাপার।

অফিসারটির ছোট বোনও এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল, কিন্তু কোন ফল হয়নি। বোনের নাম যেন কিছুতেই না প্রকাশ পায়, পেলে সে বিপদে পড়বে।

এক. এই অফিসারটিকে কলকাতা থেকে কোন দূরতম জেলায় বদলি করা হোক। অফিসারটির এমন স্পর্ধা যে, বলে বেড়ায় যে তাকে কেউ ঘাঁটাতে সাহস করবে না। কারণ বর্তমান হোম সেক্রেটারি, ডি জি, আই জি, ডি আই জি, এস পি সমেত অনেক উচ্চপদস্থ আই এ এস এবং আই পি এস অফিসারের দুর্নীতির খবর তার জানা আছে।

দুই. অফিসারটি অফিসের অনেক গোপন তথ্য মহিলাকে পাচার করে এবং উভয়ে তাদের অবৈধ সম্পর্ককে ঢাকা দিয়ে রাখে। অফিসারটি কিছুদিন যাবৎ তাব স্ত্রীর বাইরে থাকার সুযোগ নিচ্ছে এবং মহিলার চক্রান্তে স্ত্রীকে ফিরতে দিচ্ছে না। লজ্জা এবং ঘৃণার ব্যাপার হল এই যে, তারা একে অপরের বাড়িতে যখন আর কেউ না থাকে তখন যায়।

তিন. আপনারা যদি অফিসারটির অফিস এবং বাড়ির এবং মহিলার বাড়ির (টেলিফোন নং ৩৩৭-৭৯৪৯) টেলিফোনে আড়ি পাতেন এবং টেপ করেন তবে দেখতে পাবেন আমাদের অভিযোগ সত্য এবং তার স্বামীর কাছে টেপ পাঠাতে পারবেন।

চার. যখন সে চোদ্দই জুন দিল্লী থেকে কলকাতা ফেরে, এয়ারপোর্ট কন্ট্রোল (টেলিফোন নং ৫৫২-৯৩৩৩) কার কাছ থেকে সে খবর পেয়েছিল? ডব্লিউ বি ০২ সি ১৯৭০ গাড়ির ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেই তা জানা যাবে। তার বাড়ি, এয়ারপোর্ট কন্ট্রোল বা রাইটার্স কন্ট্রোলকে ফোন না করে সে কেন এই মহিলাকে ফোন করতে গেল? দিল্লী যাবার খবরও এই মহিলা আগে থেকে জানত এবং বিমান বন্দরের নিরাপত্তার গোপন খবরও মহিলা জানতে পারে।

আশা করি, আপনারা এর যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন এবং অসৎ দুর্বিনীত অফিসারটিকে দূরতম কোন স্থানে বদলি করে যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।

তাদের দেখা করার তারিখগুলোর একটা তালিকা সংযুক্ত করা হল। ইতি,

গোপন চক্ষু।

চিঠির কপি এখানকার সব কাগজের অফিসে ছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর সেক্রেটারি, হোম

সেক্রেটারি, ডি জি, আই জি, ডি আই জি এবং এস পি-র কাছে পাঠানো হয়েছে।'

শুনে মসলেমের কান গরম হয়ে গেল। সব কথা তার বোধগম্যই হল না। শেষ করে কনকদা মন্তব্য করলেন, 'পুলিসের গাড়ি এবং টেলিফোন নম্বর দেখে মনে হচ্ছে, তোমাদের ভিতরের লোকই কেউ লিখেছে। কে হতে পারে তুমি কিছু বুঝতে পারছ?'

'না কনকদা। তবে যে মহিলার কথা উল্লেখ করেছে তার সঙ্গে আমার আলাপ আছে।'

'তোমার ব্যাপারে সব মিথ্যা লিখলে তো কেউ বিশ্বাস করবে না। কিছু সত্য লিখতেই হবে। কি, তোমার বন্ধুরা লিখেছে?'

'ভাল করে দেখতে হবে কনকদা। আমাকে একটা কপি দিতে পারেন?'

'কপি কেন, তুমি আসলটাই নিয়ে যাও। বুঝতে পারলে আমাকে জানিও। আমি তো এখন চলে যাব, বন্ধ করে রিসেপশানে রেখে যাচ্ছি। তুমি এসে নিয়ে নিও।'

কনকদা ফোন ছেড়ে দিলেন। মসলেম অতি কষ্টে বাইরে এল। ক্লাস থেকে বই-খাতা নিয়ে সংবাদ অফিসে রওনা হল। রিসেপশনিস্ট খামটা এগিয়ে দিল। মসলেম গাড়িতে উঠে বলল, 'এয়ারপোর্ট।'

ড্রাইভার ভুল শুনেছে ভেবে একবাব মুখের দিকে তাকাল। কোন সাড়া না পেয়ে চালাতে লাগল। গার্ড এসে দরজা খুলে দিল। মসলেম চেয়ারে বসে খামটা খুলল।

এগারো

চিঠিটা খুলে টেবিলের আলোর সামনে মেলে ধরল। প্রথমেই চোখে পড়ল, চিঠিটা মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিবকে লেখা। কাদের কপি দেওয়া হয়েছে দেখার জন্য নিচের দিকে তাকাল। স্বরাষ্ট্র সচিব ও কাগজের সম্পাদকদের ছাড়াও কপি দেওয়া হয়েছে পুলিসের ডি জি, আই জি, ডি আই জি এবং এস পি-কে। প্রতিটি পুলিসের পি অক্ষরটা এফ হয়ে গেছে। প্রতি পি অক্ষরের লুপের ডানদিকটা কেটে গেছে। মসলেমের মনে হতে লাগল, আরও কোথায় যেন এরকম দেখেছে। কোথায়? প্রাণপণ মনে করার চেষ্টা কবতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ে না। প্রতিবারই স্মৃতিটা চেতনা স্পর্শ করে আবার হারিয়ে যায়, ধরা দেয় না। বাধ্য হয়ে মসলেম অফিস, বাড়ি, বন্ধু-বান্ধব প্রতিটা ব্যাপারকে আলাদা আলাদা করে দেখতে লাগল। আর তখনই ধরা পড়ল। সেদিন রাতে মহুয়ার স্বামী তাকে যে কাগজগুলো দেখতে দিয়েছিল তাতে এরকম সব পি অক্ষর এফ ছিল। মসলেম জিজ্ঞেস করেছিল, 'সব পুলিসকে ফোলিস বানিয়েছেন কেন? সে সলজ্জ উত্তর দিয়েছিল, 'আর বলবেন না, আমাব ঘরের টাইপ মেশিনটার পি অক্ষরটা কেটে গিয়ে ওরকম এফের মত হয়ে গেছে। অরিজিনাল কপিটা আমি কারেকশান করে দিয়েছি। এ কপিটা আর করা হয়নি।' তার মানে, এ চিঠিটাও ঐ মেশিন থেকে টাইপ করা।

চিঠির প্রথমেই যারা চিঠি লিখছে তারা যে পুলিসের লোক সেটা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। নিজের পরিচয় গোপন রাখার প্রচেষ্টা। কিন্তু বেচারা জানে না যে,

ঐ হাউসিঙে মসলেম ছাড়া আর কোন পুলিসের লোক থাকে না। অতএব কোন পুলিসের লোক এ চিঠি লেখেনি। চিঠিতে বোনের উল্লেখও তাই প্রমাণ করে। তার দেহরক্ষী বা ড্রাইভার ছাড়া পুলিসের প্রায় কেউই জানে না যে, মীনা এখানে থেকে পড়াশোনা করে। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে এমনকি ভুলভাবে 'অ্যাণ্ড'-এর ব্যবহারও তার কাগজেই চোখে পড়েছিল। স্বামীর যে কিছু করার নেই সে সাফাইও চিঠিতে এসে গেছে। অন্য লোক লিখতে গেলে তার সাফাই গাইতে যাবে কেন?

দিল্লী থেকে ফোনের কথাটাও লিখেছে। যখন ফোন করে তখন ওখানে দুজন পুলিসের লোক ছিল বটে। ইন্সপেকটার তরুণ বিশ্বাস আর সাব-ইন্সপেকট্রেস মালা ব্যানার্জী। কিন্তু তাদের কেউই ওরকম জঘন্য ধরনের নয়। তারা এরকম চিঠি কখনই লিখবে না। তাছাড়া তারা বুঝবেই বা কি করে, মসলেম কাকে ফোন করছে? তাদেরকে বাদ দিলে বাকি থাকে মসলেমের গার্ড ড্রাইভার আর মহুয়ার স্বামী। গার্ড ও ড্রাইভারদের মধ্যে কেউই ওরকম জঘন্য ধরনের নয়। বাকি থাকে শুধু একজনই। আচ্ছা, মসলেম দিল্লী থেকে মহুয়াকে ফোন করেছিল কেন? অসামরিক বিমান পরিবহন নিরাপত্তার ওপর একটা ট্রেনিঙে অফিসারদের নিয়ে দিল্লী গিয়েছিল। যেদিন ফেরার টিকিট কাটা ছিল সেদিন কারা বনধ ডাকল। ফেরার তারিখ একদিন এগিয়ে দিতে হল। দুপুর বেলায় টিকিট কেটে সন্ধ্যাবেলায় ট্রেনে চাপতে হবে, হাতে একদম সময় নেই। বঙ্গভবনের কেয়ারটেকারকে বলতে একটা এস টি ডি করার অনুমতি দিলেন। কিন্তু কাকে করবে? এয়ারপোর্ট কন্ট্রোল একটানা এনগেজড। রাইটার্সে আই জি কন্ট্রোল কেউ ধরছে না। দুপুরে বাড়িতে কেউ থাকে না। তখনই মহুযার কথা মনে পড়ল। মহুয়াকে ফোন করে এয়ারপোর্ট কন্ট্রোলকে খবর দিয়ে দিতে বলল। এ ঘটনা তো অন্য কারও জানার কথা নয়।

চিঠিটা কয়েকবার পড়ে, খুঁটি-নাটি চিন্তা করে মসলেম নিঃসন্দেহ হল যে এ কাজ মহুয়ার স্বামী ছাড়া আর কারও নয়। রক্তের মধ্যে আগুন জ্বলতে লাগল। মনে হল, চিঠির একটা কপি ওর ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের কাছে পাঠিয়ে দেয়। তা হলে স্বাদটা বুঝবে। কিন্তু যে লোক নিজের স্ত্রীকে নিয়ে এরকম চিঠি অন্য লোকেব কাছে লিখতে পারে, তার আর কি হবে? তাছাড়া সে নিচ হয়েছে বলে মসলেমও নিচ হতে পারে না। ভুল তারই হয়েছে। মীনার কাছ থেকে টেলিফোনের ব্যাপারটা জানার পরই তাদেব সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা উচিত ছিল। পাপ সে কবেছে, অতএব প্রায়শ্চিত্ত তাকেই করতে হবে।

তবে আর নয়, আজ থেকেই ওদেব সঙ্গে সব রকম সম্পর্ক ছেদ করতে হবে। কোনরকম তর্কে সে যাবে না, শুধু তার সিদ্ধান্তের কথা সে জানিয়ে দেবে। এখনই ওদের বাড়িতে ফোন করবে। শয়তানটা টেলিফোন টেপ কবার জন্যও অনুরোধ করেছে। যদি সেটা শুরু হয়ে থাকে, তা হলে তার এখনকার কথাও টেপ হবে। কিন্তু না করলেও তো নয়। মহুযাও ফোন করতে পারে। ফোন না করে বাড়িতে গিয়ে হাজিরও হতে পারে। সেও তো জানে না, চিঠি তার হাতে পৌঁচেছে। অতএব ভিজে বেড়ালটির মত স্বামীও সঙ্গে আসতে পাবে। সেটা আরও বাজে হবে। তার থেকে সব হিসেব এখনই মিটিয়ে ফেলা ভাল।

বারো

মসলেম ফোন করল। মহুয়া ফোন ধরেই আন্তরিকভাবে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার? কোথা থেকে বলছেন?'

মসলেম ঠিক যে ভাবে বলবে ঠিক করেছিল, সে ভাবে বলা হল না। গলার স্বরটা একটু মোলায়েম করে উত্তর দিল, 'অফিস থেকে।'

'রাত আটটা বাজতে চলল, এখনও অফিসে? ক্লাসে যাননি?'

'না।'

'কেন?'

'একটা বড় ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ছিল তাই।'

'কি সিদ্ধান্ত নিলেন?'

'সেটা জানানোর জন্যই ফোন করা। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এই মুহূর্ত থেকে আপনার এবং আপনার স্বামীর সঙ্গে আমি কোনরকম সম্পর্ক রাখব না। আমি আর কখনও আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব না। আমি আশা করব, আপনারাও আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন না।'

'আপনি কি ঠাট্টা করছেন?'

'না। আমি যা ঠিক করেছি তাই বলছি এবং আমি যা বলছি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। এইটাই হবে আমার আপনাদেরকে করা শেষ ফোন। ইতিমধ্যে যে দেখা হয়েছে, সেইটাই হবে আমার আপনাদের সঙ্গে ইচ্ছাকৃত শেষ দেখা।'

'কিন্তু কেন?'

'সেটা নিয়ে আমি তর্ক করতে চাইনে।'

'আপনি এরকম করতে পারেন না। হতে পারে, আমি যেচে গিয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করেছি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আপনি আমাকে এভাবে অপমান করতে পারেন। কেন এরকম ব্যবহার করছেন, আপনি বলতে বাধ্য।'

'বাধ্য আমি নই। তবে শুধু এইটুকু জেনে রাখুন, আপনার স্বামী যে ব্যবহার করেছেন, তারপর আর সম্পর্ক রাখা যায় না।'

'আমার স্বামী কি করেছে?'

'আপনার সঙ্গে আমার অবৈধ সম্পর্ক আছে, বেনামে একথা লিখে বিভিন্ন জায়গায় চিঠি পাঠিয়েছেন!'

'বেনামী চিঠি পড়ে কি করে বুঝলেন যে রহমান লিখেছে?'

'পড়লে আপনিও বুঝতে পারবেন!'

'পড়ুন, শুনি।'

'আমি আপনাকে একটা কপিই পাঠিয়ে দেব।'

'যখন পাঠাবেন পাঠাবেন, এখন দয়া করে পড়ুন।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মসলেম চিঠিটা পড়ে শোনাল। শুনে মহুয়ার গলার স্বর স্তিমিত হয়ে গেল। করুণ কণ্ঠে বলল, 'এরকম চিঠি রহমান লিখতে পারে না। অন্য কেউ লিখেছে।'

'আপনার বিশ্বাস অনুসারে আপনি চলুন। আমার বিশ্বাস অনুসারে আমি চলব।'

'দিল্লী থেকে ফোনের কথা দেখে ওরকম ভাবছেন তো! সেদিন ওর জন্মদিন, যখন আপনার ফোন আসে তখন সেনগুপ্ত আঙ্কেলও ছিলেন। বদমায়েশিটা উনিই করেছেন।'

'আপনার স্বামীকে আপনি আমার থেকে অনেক বেশি দিন ধরে দেখছেন, অতএব আপনি তাকে আমার থেকে অনেক ভাল বুঝবেন। তবে আমি বলছি, শুধু এই চিঠিখানিই নয়—থানার বড়বাবুর কাছে পাঠানো, দেবাশীষদার বাড়িতে পাঠানো চিঠিগুলিও আর কারও নয—স্বয়ং আপনার স্বামীর লেখা।'

'কি বলছেন আপনি?'

'আমি আপনাকে বিশ্বাস করতে বলছি না। আপনার বিশ্বাস আপনাব কাছে। আমি আমার বিশ্বাস মত কাজ করব। আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি ফোন ছেড়ে দিচ্ছি।'

মহুয়া কিছু বলার আগেই মসলেম ফোন ছেড়ে দিল। রাগে-দুঃখে মাথাটা ভেঙে যাচ্ছিল। দু হাত দিয়ে মাথাটা ধরে খানিকক্ষণ বসল। মনটাকে শক্ত করার জন্য ভাবার চেষ্টা করল। খারাপ সময়ে এরকম মুষড়ে পড়া তাকে মানায় না। ঝড়-ঝঞ্ঝা যতই আসুক, তার মোকাবিলা করতে হবে।

সে উঠে জেরকস মেশিনটার কাছে গেল। চিঠিটার দুটো কপি করল। কপি দুটো আলাদা করে ভাঁজ করে খামে ঢুকাল। বেল বাজিয়ে গার্ডকে ডেকে বলল, 'বাড়ি যাব। গাড়ি লাগাতে বলুন।'

গার্ড ফিরে এসে জানাল, 'গাড়ি রেডি।' মসলেম উঠতে যাচ্ছিল, ফোনটা বেজে উঠল। ধরতেই ওপার থেকে রহমানের কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

রহমান বলল, 'মিসেস বলল, আপনি নাকি বলেছেন যে, আমি আপনার বিরুদ্ধে চিঠি লিখে বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়েছি!'

'আপনি ভাল করেই জানেন যে, আপনি তা করেছেন।'

'কি বলছেন? আপনি তো জানেন, ব্যাঙ্কে আমার কাজে কত চাপ, এর মধ্যে চিঠি লিখে, টাইপ করে, জেরকস করে, খামে টিকিট লাগিয়ে পাঠাবার মত সময় কোথায়?'

কথাটা শোনামাত্র মসলেমের মনে সামান্য যেটুকু সন্দেহ ছিল তাও দূর হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি করে চিঠিটা বের করে দেখল। হ্যাঁ মেশিনের দাগ দেখে মনে হচ্ছে চিঠিটা জেরকস করা কপি। চিঠিটা হাতে লেখা না টাইপ করা, কার্বন করা না জেরকস করা, হাতে পাঠানো না ডাকে পাঠানো তা মসলেম এখনও মহুয়া বা তার স্বামীকে জানায়নি। তা হলে সে চিঠিটা নিজে না লিখলে কি করে জানল যে চিঠিটা টাইপ করা, জেরকস করা, ডাকে পাঠানো?

রহমান বলে চলল, 'না, ওরকম ভাববেন না। যোগাযোগ ছিন্ন করবেন না। আপনি আমাদের বাড়ি আসুন, আমরাও আপনার বাড়ি যাব।'

'আমাকে মাফ করবেন। আমি আর কখনও আপনাদের বাড়ি যাব না। আপনারাও কেউ আমার বাড়ি আসুন, আমার ইচ্ছে নয়। আপনার আর কিছু বলার না থাকলে আমি ছাড়ছি।'

মসলেম ফোন ছেড়ে দিল। অফিস থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে বসল।

তেরো

দরজা ঠেলে ঢুকতেই মীনা জানাল, 'দাদা, মহুয়া ফোন করেছিল। আপনি ফিরলেই ফোন করতে বলেছে। বলেছে, 'রাতে আমাদের এখানে খাবে।'

মসলেমের ভাল লাগল না। তার মানে, মহুয়া তার সিদ্ধান্ত বিশ্বাস করেনি। সে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়বে। কিছুতেই ফোন করবে না। মীনার কথার কোন উত্তর না দিয়ে জামা-কাপড় ছাড়ল। হাত-মুখ ধুয়ে এসে খাবার টেবিলে বসল।

মীনা আবার মনে করিয়ে দিল, 'দাদা, ফোন করলেন না? শেষে আমাকে দোষ দেবে, বারবার করে বলেছে কিন্তু।'

মীনাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বলল, 'ও সব পরে হবে। খুব খিদে পেয়েছে আর ক্লান্ত লাগছে। দয়া করে ভাতটা আমাকে আজ বেড়ে দাও।'

মীনা তাড়াতাড়ি করে ভাতের থালাটা এনে রেখেছে। বোতল থেকে গ্লাসে জল ঢালছে, অমনি ফোনটা বেজে উঠল। তুলতেই মহুয়া বলল, 'আপনি পৌঁছে গেছেন তো, আমরা আসছি।'

'দেখুন, আমার ইচ্ছে নয় যে আপনারা আমার বাড়িতে আসুন।'

'আপনি যে এরকম ব্যবহার করছেন, শুধু অনুমান ছাড়া আপনার কাছে রহমানের বিরুদ্ধে একটিও প্রমাণ আছে?'

'একটি নয়, অনেক প্রমাণ আছে।'

'আর কিছু নয়, আমি শুধু প্রমাণগুলো জানতে চাই। আমি আসছি।'

'বাড়িতে নয়, যদি সত্যিই জানতে চান, অফিসে আসুন। সব জানিয়ে দেব।'

'বাড়িতে নয় কেন? আমি আজকেই জানতে চাই। আজকে নয় কেন?'

'আজকে নয় এই জন্য যে, আমার মন-মেজাজ ভাল নেই। আমি এ নিয়ে অযথা তর্ক করতে চাই নে। আমি আপনাকে তো জানি। আমি সারারাত ধরে আপনাকে বোঝাতে পারব না। আপনি যদি এরপরও আসতে চান, আপনার বাবাকে নিয়ে আসুন। আমি তাঁকে বোঝাতে পারব।'

'আমাকে এত অপমান করেও আপনার সাধ মিটছে না? আমি আপনার সঙ্গে নিজে থেকে আলাপ করতে গিয়ে অপরাধ করে ফেলেছি, আমাকে যা খুশি বলুন। কিন্তু প্লিজ, বাবাকে এর মধ্যে জড়াবেন না।'

'আমাকে ভুল বুঝবেন না, আমি আপনার বাবাকে অপমান করতে চাইনে। করার কোন কারণও নেই। আমার একটাই অনুরোধ, আমাকে আপনারা রেহাই দিন।'

'ঠিক আছে। আমি আপনার সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ রাখব না। আপনি বাবাকে কিছু বলতে যাবেন না।'

'ঠিক আছে।'

মসলেম ফোন ছেড়ে দিল। মীনা মুখ ভার করে বলল, 'ছি দাদা, মানুষকে অমনি করে বলে? আমারই অন্যায় হয়েছে, কথাটা আপনাকে বলে।'

মসলেম কোন উত্তর করল না।

'হেরোইন কেসে'র আসামী রীতা বোসকে নিয়ে পাইকাড়ীবাজার থানার বড়বাবু মুকুল মণ্ডল বেশ মুশকিলে পড়েছে। পাড়ায় খোঁজ নিয়ে দেখে প্রতিবেশীরা সবাই বলছে, 'হ্যাঁ, ওর স্বামীটা পাতা বেচত বটে। তবে ও খেটেখুটে খায়, ওসব করে না। মহিলার স্বামী জেলে। তিন-তিনটে মেয়ে। বড়টা'র বয়স বারো, ছোটটার চার। মা জেলে গেলে সব কটা ভেসে যাবে। কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, সত্যি বলছে। মনে হচ্ছে, তাকে দিয়ে যে হেরোইন বইয়ে নেওয়া হচ্ছিল সেটা ও জানত না। ওর কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত নয়। কিন্তু হেরোইনের ব্যাগসমেত হাতেনাতে ধরা পড়েছে। পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ব্যাগে যা ছিল তা হেরোইন। কোর্ট ধরে নেবে, জেনেশুনে হেরোইন নিয়ে যাচ্ছিল। ছাড়া পাবার একমাত্র উপায়, ব্যাগে যে হেরোইন ছিল সেটা তার জানা ছিল না প্রমাণ করা। সেটা প্রমাণ করা সহজ নয়। মহিলার যা অবস্থা, ভাল উকিল দিতে পারবে না। আর মহিলাকে নির্দোষ প্রমাণ করে জজের দিকে সন্দেহের তীরটা ঘোরানোর জন্য পবন যোশী নিশ্চয় ভাল উকিল নিযুক্ত করবে না। রিপোর্টটা হাতে নিয়ে মুকুল ভাবছিল, আইন অনুসারে তার ন্যূনতম সাজা হবে দশ বছর জেল এবং এক লাখ টাকা জরিমানা। কিছুতেই ছাড়া যাবে না। অথচ আসল অপরাধী পবন যোশী—পানু হালদার বা নরেশ পালকে ধরা যাচ্ছে না।

রিপোর্টটার ওপর পেপারওয়েট চাপা দিয়ে মুকুল মহিলার দিকে মুখ ফেরাল, 'কিন্তু পবন যোশীর সঙ্গে আপনার যোগাযোগ হল কি করে?'

'পারুর বাবার জেল হলে আমাদের সংসার একদম চলছিল না। দিনের পর দিন খাওয়া জুটত না। আমি পাগলের মত একটা কাজ খুঁজছিলাম। নরেশদা নিয়ে গিয়ে কাজে লাগিয়ে দিল।'

'কিরকম কাজ?'

'হোটেলের থালাবাসন মাজা আর ঝাড় দেওয়া।'

'বেশ তো করছিলেন, তা এই হেরোইন বওয়ার কাজ কবে থেকে শুরু করলেন?'

'বিশ্বাস করুন, আমি শুরু করিনি। ব্যাগে ও জিনিষ দিত আমি জানতাম না।'

'ঠিক আছে, জানতেন না। কবে থেকে ব্যাগ দিতে শুরু করল?'

'সপ্তাহ দুয়েক পর থেকে। দিয়ে বলত, 'নরেশকে দিয়ে দিও, খাতাপত্রগুলো সেরে রাখবে। কাল আসার সময় মনে করে নিয়ে এসো।' '

'রোজই দিত?'

'না, তবে মাঝেমাঝেই দিত।'

'মোট কত দিন দিয়েছে?'

'একেবারে ঠিক তো বলতে পারব না। আন্দাজ পঁচিশ-তিরিশ দিন হবে।'

'এই পঁচিশ-তিরিশ দিনে একবারও খুলে দেখলেন না, শুধু খাতাপত্র আছে, না ভিতরে অন্য কিছু আছে?'

'বাবু, আমার একবারও সন্দেহ হয়নি। আর ভয়ও ছিল। মালিকের জিনিষ, খুললে যদি ধরা পড়ে যাই?'

'হুঁ।' মুকুল বেল বাজিয়ে দিল। দফা এসে দাঁড়ালে বলল, 'নিয়ে যান।'

দফা মহিলাকে নিয়ে চলে গেলে মুকুল অমলবাবুকে জিজ্ঞেস করল, 'পবন যোশী যে এতদিন ধরে ড্রাগের কারবার চালাচ্ছে তা আমাদের লোকদের চোখে পড়ল না কেন?'

'কি করে পড়বে স্যার, মাসে মাসে তো টাকা নিয়ে আসে!'

'তা হলে এবার ধরল কেন?'

'তিন মাস ধরে টাকার বখরা নিয়ে মন-কষাকষি চলছিল। মেজবাবু বলছিল, দশ হাজারে চলছে না, পনের হাজার করে দিতে হবে। পবন বলছিল, একবারে অত বাড়াতে পারব না, বারো করে নাও। যাতে আর বেগড়বাই না করে তার জন্যই ধরা। আর আপনাকে কাজ দেখানোও হল। এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাকে বলে।'

'তা হলে পবন তো এরপরেও কারবার চালাবে। লোক লাগান তো, হাতেনাতে ধরতে হবে।'

'কিন্তু কাকে লাগাব স্যার? এক হাবিলদার হারুন আর কনস্টেবল কমল। তা ছাড়া আর সব তো খানেওয়ালা পার্টি। ওর কারবারের খবর আমাদের না দিয়ে আমাদের গতিবিধির খবর ওকে দেবে।'

'কমলকেই লাগান। একটু...'

কথা শেষ হবার আগেই পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের এক অচেনা যুবক ঘরে ঢুকে পড়ায় মুকুল খুব বিরক্ত হল। রেগে গিয়ে জোরে জোরে বেল বাজাতে লাগল। দফা ঘরে ঢুকলে বলতে লাগল, 'ধীরেন, আপনারা কি করেন? একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছি, এই সময় বাইরের লোককে ঘরে ঢুকতে মানা করতে পারেন না?'

ধীরেন মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, 'স্যার, আমি মহিলাকে হাজতে রাখতে গিয়েছিলাম, উনি সেই ফাঁকে ঢুকে পড়েছেন।'

'সরি স্যার।' বিব্রত যুবক দুঃখপ্রকাশ করে বলল, 'আমার ভুল হয়ে গেছে, অনুমতি না নিয়ে ঢুকে পড়েছি। বাইরে অপেক্ষা করছি স্যার, আপনার সময় হলে একটু কথা বলব।'

যুবকটির কথাবার্তা বড়বাবুর ভাল লাগল। নিজের উগ্র ব্যবহারের জন্য একটু অনুতাপও হল। গলার স্বরটা মোলায়েম করে বলল, 'আর বাইরে যেতে হবে না। ঢুকে যখন পড়েছেন কি দরকার বলে ফেলুন। সেটা শুনে আবার আমরা আলোচনা করব।'

'স্যার, আমি একটা এফ আই আর লেখাতে চাই।'

বড়বাবু নড়েচড়ে বসলেন, 'কেন? কি হয়েছে?'

'কিংকং তার দলবল মিলে আমাকে প্রচণ্ড মারধোর করেছে। প্রতিবেশীরা এগিয়ে না এলে হয়ত শেষই করে ফেলত। মুখের একপাটি দাঁত গেছে। ডান হাতটাও বোধহয় ভেঙেছে। আরও শাসিয়ে গেছে, 'এরপরেও দাদাগিরি করতে গেলে একেবারে শেষ করে দেব।'

মুকুল দেখল, যুবকটির বাঁ-দিকের ঠোঁটটা একটু ফোলা। ডান হাতটা কেমন ঝুলে আছে। ঠোঁটের রক্তের দাগটা বোধহয় মুছে ফেলেছে। না, বাড়িয়ে দেখানোর কোন চেষ্টা নেই। তাই সহানুভূতির সুরে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কিরকম দাদাগিরি করেছিলেন?'

'আমি কোনরকম দাদাগিরি করিনি স্যার। সুরেশ সিংয়ের অফিসের সামনে একজন বিধবা মহিলার এক চিলতে জমি আছে। সুরেশ সিং ওটা কিনে নিতে চেয়েছিল। মহিলার ওখানে একটা ছোট্ট দোকান আছে। ওটা ছাড়া আয়ের কোন উৎস নেই। বেচতে চায়নি। এটা সুরেশ সিংয়ের সহ্যের বাইরে। জমিটা জবরদখল করে নিতে চেয়েছিল। আমরা পাড়ার ছেলেরা বাধা দিয়েছি, এই আমাদের অপরাধ।'

'না না, এটা তো খুব ভাল কাজ। আপনারা পুলিসকে জানাননি কেন?'

'জানিয়েছিলাম স্যার, কোন ব্যবস্থা হয়নি। আপনার থানায় রিসিভ করা কপি আমাদের কাছে এখনও আছে।'

'জানিয়েছিলেন, অথচ কোন ব্যবস্থা হয়নি? আশ্চর্য! আচ্ছা দেখছি। ধীরেন ওনাকে ডিউটি অফিসারের কাছে নিয়ে যান তো, কেসটা আগে লিখে নিক।'

'স্যার, ওনার কাছে গিয়েছিলাম। উনি কেস লিখতে চাইছেন না।'

'কি করে লিখব স্যার?' দরজার কাছ থেকে ডিউটি অফিসার মেজবাবু ভূদেব রায় ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠল, 'কিংকং আজ তিন বছর হল জেলে আছে। আর ও বলছে, কিংকং এসে ওকে মারধোর করেছে, কেস কি করে লিখব?'

'সেটা কি করে হয়? মেজবাবু বলছেন, কিংকং জেলে আছে। আপনি বলছেন, ও আপনাকে মেরেছে। সেটা কি করে সম্ভব?'

'স্যার, আপনারা বলছেন জেলে আছে। আর আমরা রোজ দেখছি আমাদের সামনে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি স্যার ওকে খুব ভাল করে চিনি। আমি নিজে চোখে দেখেছি। ও ছিল, ও নিজে মারধোরও করেছে।'

যুবকটির কথা শুনে মুকুলের ধন্দ লেগে গেল। একটা কি ভেবে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, সত্য-মিথ্যা পরে দেখা যাবে। এখন উনি যা বলছেন সেইমত কেস লিখে নিন।'

যুবকটি একটু আশার আলো পেয়ে বলে উঠল, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।'

মেজবাবু হতাশায় মুখঝামটা দিয়ে বলল, 'আয়।' নিজের ঘরে গিয়ে সহকর্মীদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, 'বড়বাবুও হয়েছে যেমন। যে যা বলবে তাই করতে হবে। এরকম করে কাজ করা যায়? আমার হয়েছে যত ঝামেলা!'

যুবকটি অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কনস্টেবল কমল এসে অমলবাবুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে আস্তে করে বলল, 'স্যার, আমাদের বিশ্বনাথ এস টি ডি বুথ থেকে সুরেশ সিংকে ফোন করে বলছে, 'বিপ্লব থানায় কেস করতে এসেছে।'

বড়বাবু কথাটা শুনে চোখ বড় বড় করলেন, 'বিপ্লবটা কে?'

দাঁড়িয়ে থাকা যুবকটি উত্তর দিল, 'স্যার, আমার নাম বিপ্লব।'

কমল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। ও-ঘর থেকে মেজবাবুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'শালা চুগোলখোর! বড়বাবুর কাছে আবার চুগলি কাটতে গিয়েছিলি? কি চুগলি কেটে এলি?'

মুকুলের খুবই খারাপ লাগল। একবার ভাবল, মেজবাবুকে ডেকে পাঠাবে। আবার ভাবল, সে কারও কথা কান পেতে শুনেছে, এটা প্রকাশ করা ভাল দেখায় না। বরং মৌকা বুঝে মেজবাবুর ব্যবস্থা করা যাবে। আপাতত বেল বাজিয়ে দিল। দফা এসে দাঁড়ালে বলল, 'এই ভদ্রলোককে মেজবাবুব কাছে নিযে যান আব বিশ্বনাথকে ডাকুন।'

দফা বিপ্লবকে নিয়ে চলে গেল। খানিকক্ষণ পরে ফিবে এসে জানাল, 'বিশ্বনাথ থানায় নেই।'

'মেজবাবুকে জিজ্ঞেস করুন, কোথাও পাঠিযেছেন কিনা।'

দফা জিজ্ঞেস করতে গেল। একটু পরে মেজবাবু এসে জানাল, 'আমি কোথাও পাঠাইনি স্যার। জুতোর কালি কিনতে হবে বলে একটু বের হল।'

'ঠিক আছে। ধীরেন, বিশ্বনাথ ফিরলেই সোজা আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন।'

ধীরেন মাথা নেড়ে জানাল, 'ঠিক আছে স্যার।'

মেজবাবুও বিদায় নিল। একটু পরে বিশ্বনাথ এসে দাঁড়াল। মকুল জিজ্ঞেস করল, 'কি কালি কিনলেন?'

'কিসের কালি স্যার?'

'হ্যাঁ, তাও তো বটে। আপনি তো আসলে কালি কিনতে যাননি। তা সুরেশ সিংয়ের সঙ্গে কি কথা হল?'

'কোন সুরেশ সিং স্যার?'

'যার সঙ্গে এস টি ডি বুথ থেকে কথা বলছিলেন?'

বিশ্বনাথ একটু চমকে উঠল। কোন উত্তর করল না। মুকুল বলল, 'আপনি যদি মনে করেন যে, সুরেশ সিংযের স্বার্থ দেখা বেশি জরুরি তা হল সুরেশ সিংযের অধীনেই চাকরি নিয়ে নিন। সরকারের অধীন পুলিসের চাকরি করবেন আর অপরাধীরই স্বার্থ দেখবেন, এটা চলতে পারে না। যদি মনে করেন যে সুরেশ সিং অনেক বেশি বেতন দেয়, তা হলে এ চাকরিটা ছেড়ে দিন।'

'না স্যার, আমার চাকরিটা খাবেন না স্যার। পরিবার, বেকার ছেলে, বিধবা মা— একমাত্র আমি আর্নিং মেম্বার স্যার। আর এ চাকরিটা গেলে কি সুরেশ সিং আমাকে পুঁছবে স্যার?'

'সেটা যদি বোঝেন, তা হলে তো চাকরিটা রাখার কথা ভাবতে হয়। যান, ভাল করে চিন্তা-ভাবনা করুন। কাল সন্ধ্যাবেলা আমাকে জানাবেন, কি ঠিক করলেন।'

বিশ্বনাথ বেরিয়ে গেল। বিপ্লব এসে বলল, 'স্যার, তা হলে আমি হাসপাতালে যাচ্ছি।'

'যান। তার আগে আপনার জানা থাকলে বলুন তো, সুরেশ সিংযের সঙ্গে আমাদের পুলিসের লোকদের এত দহরম-মহরম হল কি করে?'

'স্যার, আপনি জানেন না? আপনাদের বেণীবাবু তো ওর বিজনেস পার্টনার!'

'কোন বেণীবাবু?'

'ঐ যে, এস আই থেকে যিনি ডি সি হয়ে রিটায়ার করেছেন। চাকরিতে থাকতেই সুরেশ সিংয়ের সঙ্গে ওনার বেনামে ব্যবসা ছিল। এখন প্রকাশ্যেই। ওনার সাহায্যেই

সুরেশ সিং জবরদখল, বেআইনী নির্মাণ এবং নকল মাল বিক্রি করে প্রচুর সম্পত্তি করেছে। ওনাকেও করে দিয়েছে। এই তো ক্যানিং স্ট্রিটে একই বিল্ডিঙে একসঙ্গে দুজনের অফিস। একই সঙ্গে দুজনের ফ্ল্যাট। শুনেছি ওনার থিয়েটার রোডেও একটা ফ্ল্যাট আছে। দু-দুটো গাড়ি আছে।'

'কিন্তু উনি তো এখন চাকরিতে নেই।'

'তা নেই, তবে চাকরিতে থাকা অনেক অফিসারই এখনও ওনার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেন। বেণীর মত সম্পদশালী হওয়ার জন্য সুরেশ সিংদের সাহায্য করেন। এই তো সেদিন সুরেশ সিংয়ের ছেলের বিয়ে হল। বেণীবাবুর সঙ্গে অনেক পুলিস অফিসারই উপস্থিত ছিলেন। আপনার থানার ভূদেববাবুও গিয়েছিলেন।'

'হুঁ।' মুকুল গম্ভীর হয়ে গেল। একটু পরে বলল, 'বুঝলাম। আপনি আমার আর একটা উপকার করুন তো?'

'বলুন স্যার।'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কিংকং-এর একটা ছবি আমাকে যোগাড় করে দিন।'

'আমি আজকেই দিয়ে দেব স্যার।'

বিপ্লব বেরিয়ে গেল। মুকুল কনভিকশান রেজিস্টারটা নিয়ে দেখতে লাগল। হ্যাঁ, খুনের মামলায় তিন বছর আগে কিংকং ওরফে রতন সরকারের যাবজ্জীবন জেল হয়েছে। এখন আলিনগর কেন্দ্রীয় জেলে আছে।

বেলা বারোটার সময় গিয়ে কিংকংয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য সুরেশ সিং নামে স্লিপ পাঠাল। একটু পরেই স্লিপ ফেরত এল, কয়েদী কারও সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন না। ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছিল, আর তখনই জেলে ঢুকছিল ডাক্তার অনিল ব্যানার্জী। অনিল মুকুলের পাশের গ্রামের লোক। বিশেষ পরিচিত। মুকুলকে দেখতে পেয়েই সে এগিয়ে এল। মুকুল তাকে সব কথা খুলে বলল। শুনে অনিল বলল, 'ডোন্ট ওরি। আমি তোকে আমার গেস্ট করে ঢুকিয়ে নিচ্ছি। আর একবার ভিতরে ঢুকে গেলে কে কার খোঁজ রাখে? চল।' অনিলের অতিথি হয়ে মুকুল ভিতরে ঢুকে গেল। ছবির সঙ্গে মিলিয়ে বুঝল, কিংকংয়ের নামে অন্য লোক জেল খাটছে। বেরিয়ে এসে কয়েদী কিংকংকে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি চেয়ে কোর্টে দরখাস্ত লিখছিল, মেজবাবু এসে জানালেন, 'সাট্টার এক বড় পাণ্ডা ধরা পড়েছে স্যার। সীতারাম জৈনের লোক।'

শুনে মুকুলের মনটা একটু প্রসন্ন হল। মাসখানেক আগে এক সাট্টা ডনের আড্ডায় বিস্ফোরণে ডজনখানেক লোক মারা যাওয়ায় সাট্টার প্রতি সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। কর্তারা সাট্টা বন্ধ করার হুকুম জারি করেছেন। মুকুল থানার দায়িত্ব পাওয়ার দিন থেকেই সাট্টা বন্ধ করার চেষ্টা করে আসছে, কিন্তু সে চেষ্টা ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করার মত। কোন দিন তার লোকেরা একজন পেন্সিলার ধরে নিয়ে এসেছে, কোন দিন একজন রানার। আসল লোকের হদিস এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। আজ অন্তত একজন বড় পাণ্ডা ধরা পড়েছে। তাও আবার সাট্টার সর্বাধিনায়ক সীতারামের লোক। মুকুল বলল, 'নিয়ে আসুন তো। আমি একবার শুনতে চাই, কি করে কারা কারবারটা চালায়।'

'নিশ্চয় স্যার। কিন্তু এক্ষুনি কোর্টে পাঠাতে হবে, না হলে আবার নেবে না।'

'তা হলে পাঠিয়ে দিন। তবে যাতে পুলিস হেফাজতে পাওয়া যায় সেটা দেখবেন।'

'নিশ্চয় স্যার। তবে এই ম্যাজিস্ট্রেটটা না স্যার, একদম কাস্টোডিতে দিতে চায় না স্যার।'

'আচ্ছা নিয়ে আসুন, আমি ভাল করে সুপারিশ করে দিচ্ছি, যাতে করে কাস্টোডিতে দেয়।'

'আচ্ছা স্যার', বলে মেজবাবু মুখ বেজার করে চলে গেলেন। মুকুল কোয়ার্টারে গেল।

সন্ধ্যাবেলায় এসে মুকুল সাট্টার 'বড় পাণ্ডা'কে নিয়ে পড়ল, 'আপনার নাম কি?'

'মুস্তাকিম।'

'কোথায় থাকেন?'

'বেলগাছিয়া।'

'সাট্টাটা কিভাবে চালান, একটু খুলে বলুন দেখি?'

'আমি কিছু জানিনে স্যার।'

'জানেন না? হাজতে কয়েক দিন থাকলেই জানবেন। সীতারামের সঙ্গে কারবারটা কিভাবে চালান?'

'আমি চালাইনে স্যার।'

'কে চালায়?'

'আমি জানিনে স্যার।'

'তাও জানেন না? এ দেখছি, ভাল কথায় কাজ হবে না। বরেন, একটা শক্ত দেখে লাঠি নিয়ে আসুন তো। পিঠে কয়েক ঘা না পড়লে মুখ দিয়ে কথা বেরুবে না।'

'স্যার, এরকম তো কথা ছিল না।'

'কিরকম কথা ছিল?'

'কোর্টে যাব, ছাড়া পেয়ে যাব।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। বুলুদা ডেকে বলল, বাবুদের কেস দেখাতে হবে। আমরা গেলে তো কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, তাই তোকে পাঠাচ্ছি। বাবুদের সঙ্গে আপিসে যাবি। আপিস থেকে কোর্ট। দু-তিন ঘণ্টার ব্যাপার। কোর্ট থেকে এসে কড়কড়ে পঞ্চাশ টাকা লিয়ে লিবি।'

মুকুল বুঝতে পারল, যাকে আনা হয়েছে সে সাট্টার সঙ্গে কোনভাবে যুক্ত নয়। সাট্টার কারবারীরা তাকে ভাড়া করে পাঠিয়েছে যাতে থানার বাবুদের কেস দেখানো হয়, তাদের কারবারও সচল থাকে। সুন্দর ব্যবস্থা। প্রকাশ্যে সাট্টা চলার জন্য সাট্টার লোকদের কেউ কিছু বলতে পারবে না। কারণ স্বয়ং পুলিস তাদের রক্ষাকর্তা। পুলিসের লোকদেরও কিছু বলতে পারবে না, বললেই তাদের রেডিমেড জবাব, 'কি করব বলুন? আমরা বন্ধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করছি, এই তো কালই রেড করে ধরে কেস দিয়েছি।'

ধীরেন একটা মোটা মত লাঠি এনে টেবিলের ওপর রাখল। মুস্তাকিম সেটার

দিকে তাকিয়ে ভয়ে জড়সড় হয়ে গেল। ধীরেনকে মুকুল বলল, 'যাবার সময় দরজাটা বন্ধ করে দেবেন।' দরজার কড়া ধরে টানতেই মুস্তাকিম ভয়ার্ত স্বরে বলে উঠল, 'আমাকে মারবেন না। আমি সাট্টা চালাইনে। আমাকে ছেড়ে দিন।'

'ছেড়ে দিতে পারি যদি সীতারামকে ধরিয়ে দেন।'

'সীতারামকে আমি চিনিনে স্যার।'

'রাজুকে তো চেনেন?'

'সে আপনার থানার লোকরাও চেনে। নাগু সিং তো খুব ভাল করে চেনে। রোজ রোববার গিয়ে হপ্তা লিয়ে আসে।'

'ঐ জন্যই তো ওদের কাউকে নেব না। আপনি দূর থেকে দেখিয়ে দেবেন, আমি চট করে গিয়ে ধরে নেব।'

'তারপর তো আপনি চলে আসবেন আর আমাকে ধরে বস্তাপেটা কববে।'

'আপনি দেখিয়ে দিয়েছেন, সেটা জানবে কি কবে?'

'হাজতে এসেই তো আমাকে দেখতে পাবে।'

'আপনাকে আমি অন্য জায়গায় বাখব। ওদের সঙ্গে দেখা হবে না।'

'নাগু সিংরা তো বলে দেবে।'

'হ্যাঁ, তা দিতে পারে।' মুকুল একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আপনাকে আমি নিয়ে যাব না। আপনি রাজুর ডেরার একটা রাফ নকশা করে দিন। আর কখন কখন রানাররা প্যাড জমা দিতে আসে সেটা লিখে দিন।'

মুস্তাকিম একটা কাগজে নকশা এঁকে সময়গুলো লিখে দিল। মুকুল কাগজটা পকেটে ঢুকিয়ে মুস্তাকিমকে হাজতে পাঠাবার জন্য বেল বাজাল। ধীরেন এসে দাঁড়াবাব আগেই সেরেস্তা এ এস আই সমীর গাঙ্গুলী এসে জানাল, 'স্যার, কিংকংকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য কোর্ট থেকে অনুমতি পাওয়া গেছে।' মুকুল কোর্টের কাগজপত্রটা নিয়ে দেখল। তারপর কিংকংয়ের ছবিসমেত ফাইলটা নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

কাগজটা দেখে নিয়ে জেলের অফিসার জানালেন, 'আজ তো ভিজিটিং আওয়াব শেষ হয়ে গেছে, আর দেখা হবে না। আপনি কাল বিকেলে আসুন।'

'আমি দেখা করতে আসিনি, জিজ্ঞাসাবাদ কবতে এসেছি। তাব জন্য কোর্টেব প্রয়োজনীয় অর্ডারও নিয়ে এসেছি।'

'অর্ডার নিয়ে এসেছেন ঠিকই, কিন্তু দেখা না হলে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন কি করে? বিকেলের আগে দেখা হবে না। আর সুপার সাহেব না এলে জিজ্ঞাসাবাদের পারমিশান হবে না। সুপার সাহেব কাল বারোটার আগে আসবেন না।'

মুকুলের হতাশ লাগছিল। আগামীকাল বারটা পর্যন্ত অপেক্ষা করা তার পক্ষে বেশ কষ্টকর। সে স্বগতোক্তি করল, 'তা হলে তো আর কিছু করার নেই। কালই আসতে হবে। দেখি অনিলদাকে পাই কি না। অনিলদাকে পেলে একবার দেখা করে যাই।'

'কোন অনিলদা?'

'আপনাদের ডাক্তারবাবু।'

'তা আগে বলবেন তো যে আপনি ডাক্তাববাবুর লোক। বসুন বসুন।'

'না, আমি ডাক্তারবাবুর লোক নই। আমি ওনার পাশের গ্রামের লোক।'

'ঠিক আছে, বসুন বসুন। ডাক্তারবাবুর মত লোক হয় না। আমার ছোট ছেলেটা কেউ ভাবেনি বাঁচবে, কিন্তু ডাক্তাববাবুর ওষুধ দুদিন খেতেই উঠে বসল। এই হরেন, যা তো, ডাক্তারবাবুকে একটা খবর দে। কৈ দেখি, কোর্টের কাগজটা দিন তো ? বাসব,, সুপার সাহেবের কাছ থেকে অর্ডারটা করে আন তো? বলবি ডাক্তারবাবুর লোক, বুঝলি?'

'ওনাকে আবার এই রাতের বেলা কেন বিরক্ত করবেন? আমি কাল আবার আসব।'

'না না, ডাক্তারবাবু শুনলে কি ভাববেন! বাসব, কাগজটা নিয়ে চলে যা।'

বাসব কাগজটা নিয়ে চলে গেল। একটু পরেই অর্ডাব করিযে নিযে ফিরে এল। অনিলও এল। মুকুল অনিলেব সঙ্গে ভিতবে ঢুকল। নির্দিষ্ট জায়গায় কিংকংকে দেখে তারা দুজনেই আশ্চর্য হল। মুকুল বুঝল, এই ক'ঘণ্টাব মধ্যেই ভাড়াটে কয়েদীকে সরিয়ে দিয়ে কিংকংকে নিযে আসা হযেছে। অনিলকে অনুবোধ করল, 'আবাব ভাড়াটে কযেদী আসলে আমাকে দয়া করে একটা টেলিফোন করবেন।'

থানায় এসে সে হাবিলদাব হারুনের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা ছক কষল। বেল বাজিযে জমাদার জয়ন্তকে ডেকে বলল, 'কাল বেলা দশটা নাগাদ ছ'জন সিপাহি রেডি কবে বাখবেন।' জয়ন্ত যাতে অন্য কিছু বোঝে তার জন্য ইচ্ছে করেই হারুনের দিকে তাকিযে উচ্চারণ করল, 'হকার উচ্ছেদের জন্য কর্পোরেশন কাল দশটার সময়ই তো ফোর্সটা চেয়েছে না?' জয়ন্ত বেরিয়ে গেলে বলল, 'তা হলে ঐ কথা থাকল।'

কথামত পরের দিন বেলা দশটার সময় মুকুল ফোর্সটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। মোড়ের মাথায় গ্যারেজটার মধ্যে ঢুকিয়ে ড্রাইভার গাড়ির বনেট তুলে দিল। মাথায় গামছা বেঁধে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে হারুন বেরিয়ে গেল। একটু পরে ফিরে এসে ইঙ্গিত করতেই ড্রাইভার বনেট নামিয়ে গাড়িতে বসল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে গাড়ি এসে থামল বোলান পাল ওবফে বুলুদের বাড়িব সামনে। তখন একজন রানার সাইকেল থেকে নামছিল, হারুন গিয়ে ওকে ধবল। মুকুল ঘরে ঢুকে দেখল, আরও দুজন বানার বুলুর কাছে টাকা আর প্যাড জমা দিচ্ছে। সিপাহীরা তিনজনকেই ধরে নিল। প্রচুব প্যাড ছাড়াও পঞ্চাশ হাজাব চারশ' টাকা পাওয়া গেল। মুকুলরা বমাল আসামীদের নিয়ে গাড়িতে উঠতেই আবাব গাড়ি চলতে শুরু করল। এসে থামল সীতারামের গদির সামনে। মুকুলরা ততক্ষণে আসামীদের হাতে হাতকড়া লাগিয়ে গাড়িব সঙ্গে আটকে দিয়েছে।

রাস্তার ওপর তিনতলা বাড়ি। সম্মুখে টায়ারের দোকান। পাশে এস ডি ডি বুথ। বুথের পাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে। সিঁড়ি দিযে বছর তিরিশেক বয়সের এক যুবক ছুটে নামছিল, হারুন ওকে ধবে নিয়ে বলল, 'স্যার, এই গোপাল, সীতারামের ভাগ্নে। সাট্টার ম্যানেজার। ম্যানেজাব মুকুলদের তিনতলার একটা ঘরে নিয়ে গেল। ঘরের দরজা বন্ধ হলেও তালা লাগানো নেই। ধাক্কা দিতে দরজা খুলে গেল। মুকুল দেখল, ঘরে গাদা গাদা প্যাড, কয়েকটা খাতা, একটা সিন্দুক এবং কয়েকটা টেলিফোন আছে। টেলিফোনের রিসিভারগুলো মেঝের ওপর নামানো। তুলে দিতেই মুহুর্মুহু কল আসতে

লাগল। সবগুলো টেলিফোন একসঙ্গে বাজতে লাগল। একটা ধরতে ওপার থেকে প্রশ্ন হল, 'দশটার বাজিতে কত নম্বর উঠল?' মুকুল বুঝল, সত্যি এটা সীতারামের সাট্টার সদর দপ্তর। এখন বাজির সময়। ফল জানার জন্য ঘন ঘন ফোন আসবে। একসঙ্গে অনেকগুলো ফোনের শব্দই সাট্টার সদর দপ্তর চিনিয়ে দেবে। সেই জন্য পালানোর আগে সব ফোনের রিসিভারগুলো নামিয়ে দিয়েছিল। মুকুল আবার রিসিভারগুলো নামিয়ে দিল। গোপালের কাছে সিন্দুকের চাবি ছিল, সিন্দুক খুলে এক লাখ বিশ হাজার টাকা, কিছু কাগজপত্র এবং একটি ডায়েরি পাওয়া গেল। ডায়েরিতে এলাকার রাজনৈতিক নেতা, আমলা এবং পুলিস অফিসারের নাম-ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং সাপ্তাহিক খরচ লেখা। নিজের থানার খরচের হিসেবটা সে ভাল করে দেখে নিল। মেজবাবু ২০০, ছোটবাবু ১৫০, অন্যান্য (নাগু সিং) ৪২৫০।

হারুনকে সিজার-লিস্টটা তৈরি করতে বসিয়ে মুকুল গোপালকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, 'আপনি এই কারবারের মালিক?'

'না স্যার, আমি শুধু কাজকর্ম দেখাশুনা করি। মালিক আমাব মামা সীতাবাম জৈন।'

'এই কাজকর্ম দেখাশুনার জন্য আপনি কত বেতন পান?'

'বেতন সাড়ে চার হাজার টাকা। যে যে দিন কাজ করি তিরিশ টাকা করে খোরাকি পাই। কোথাও যেতে হলে বা বিশেষ খরচ হলে তাও দিয়ে দেন।'

'বিশেষ খরচ মানে হপ্তা?'

'না স্যার, হপ্তার টাকা উনি নিজে দেন না, রাজুর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেন।'

'পাঠিয়ে দেন মানে?'

'অফিসার বা লিডাররা তো নিজে নিতে আসেন না। কেউ কেউ অর্ডারলি পাঠিয়ে নিয়ে নেন। কাউকে কাউকে বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসতে হয়।'

'তা মামা এখন কোথায় হপ্তা দিতে গেছে?'

'হপ্তা দিতে নয়। থানা আমাদের লোককে কথামত না ছেড়ে আটকে রেখেছে, সেটা নিয়ে বেণীবাবুর সঙ্গে কথা বলতে গেছেন।'

'কোথায় কথা হবে?'

'থিয়েটার রোডে বেণীবাবুর বাড়িতে।'

'থিয়েটার রোডে বেণীবাবুর বাড়ি কোথায়? ওনার বাড়ি তো ক্যানিং স্ট্রিটে।'

'ক্যানিং স্ট্রিটে আছে, থিয়েটার রোডেও আছে। ওনার ফ্ল্যাট মামার ফ্ল্যাটের একদম ওপরে। একসঙ্গেই কেনা।'

মুকুল ভাবছিল, একটু পরে তো খবর পৌঁছে যাবে। এখন তাড়াতাড়ি গেলে হয়-তো সীতারামকে বেণীবাবুর বাড়িতে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু প্রাক্তন ডি সি-র বাড়ি থেকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে জানলে বড় বড় খবর হয়ে যাবে। অতএব ওপরের লোকদের সঙ্গে একবার কথা বলে নেওয়া ভাল। এখান থেকে বলা ঠিক হবে না, থানায় গিয়ে বলবে। হারুনকে উদ্দেশ করে বলল, 'আর কত দেরি?'

'লিস্ট শেষ স্যার। সাক্ষীদের সই নিলেই হয়ে যাবে।'

'তার আগে টেলিফোন কটাও লিখে নিন। খুলে নিয়ে গাড়িতে তুলে দিন।'

'লিখে নিয়েছি স্যাব।' সাক্ষীদের সই করাতে করাতে হারুন উত্তব দিল। গোপালকে সই করিয়ে সব কিছু নিয়ে গাড়িতে তুলল।.

থানায় পৌঁছেই মুকুল এ সি নরেশ ভাদুড়িকে ফোন কবল। এ সি ফোন ধবেই তাকে বকতে লাগল, 'তুমি যাকে-তাকে ধরে হাজতে পুরে দিচ্ছ, এটা তো ঠিক নয়।. এরকম করলে পাবলিক এজিটেশান হবে, তখন সামলাতে পাববে?'

'উপায় তো নেই স্যাব। হলে সামলাতেই হবে। কিন্তু আমি কেন যাকে-তাকে ধরে হাজতে পুরলাম?'

'কেন? সীতাবামেব ভাগ্নেকে তুমি অ্যাবেস্ট কবে আননি?'

'এনেছি স্যার। সাট্টাব প্যাড-পেন্সিল, টাকা-পয়সা, কাগজ-পত্র এমনকি টেলিফোনগুলো পর্যন্ত এনেছি। তিনতলা ঘবে হেডকোযাটার্স কবে সাট্টা চালাচ্ছিল, তাই...।'

'কিন্তু ওরা ঘর ভাড়া দিয়ে দিয়েছে, ভাড়াটে সেখানে কি কবল তাব জন্য ওদেব দোষ হতে পারে না।'

'হবে কি কবে? ডায়রিতে যে হপ্তা লেখা আছে, পাঁচশ' টাকা!' মুকুল নিজেব মনে মনে বলল। প্রকাশ্যে বলল, 'স্যার আপনি তো জানেন, জেনেশুনে সাট্টাওয়ালাদের ভাডা দেওয়া, এমনকি না জেনে ভাড়া দিলেও সাট্টা চলছে দেখে খবর না দেওযা অপরাধ। আর ভাডা দিয়েছি বললেই তো হবে না। কাকে ভাডা দিযেছে বলতে হবে। ভাড়া দেওয়ার প্রমাণ দেখাতে হবে। তবে সে সব কোন প্রশ্নই উঠছে না, কারণ ওরা ভাড়া দেওযার কথা বলছেই না। এরকম কথা ওরা কাকে বলেছে স্যার?'

'বেণীবাবুকে বলেছেন।'

'বেণীবাবুকে বলেছেন, কাবণ বেণীবাবুকে তারা নিজেদেব ফ্ল্যাটেব ওপব একটা ফ্ল্যাট কিনে দিয়েছেন। আমরা সীতারামের কাছে ফ্ল্যাট নিইনি, আমাদেবকে ওবকম অযৌক্তিক কথা বলতে পারবে না।'

'সীতারাম না পারুক, ডি সি তো পারবেন। ডি সি সাহেব প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট হয়েছেন। সীতারামের ভাগ্নেকে তাডাতাড়ি ছেড়ে দাও, বুঝেছ?'

এ সি ফোন ছেড়ে দিল। মুকুলের মন হল, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এ সি মিথ্যা করে ডি সি-র নাম নিচ্ছে। ডি সি-কে ব্যাপারটা জানিযে দিলে বেটা বেশ জব্দ হয়। কিন্তু সত্যি সত্যি যদি ডি সি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকে? তার থেকে সে ডি সি-র সঙ্গে কথা বলবে না, ভাগ্নেকেও ছাড়বে না। তবে সীতারামটাকে আর এযাত্রা ধরা হল না। তবে বাছাধন, তোমাকে আমি ছাড়ব না। থাম না, ভাগ্নেকে আগে কাস্টোডিতে নিয়ে আসি, তাবপর মামার ব্যবস্থা করব।

মুকুল যখন এরকম মামার ব্যবস্থায় মশগুল, তখন হঠাৎ কবে ফোনটা বেজে উঠল। তুলে কানে লাগাতেই অনিলের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'আজ দুপুরে তোর কয়েদী কিন্তু আবার বদল হয়েছে। এখন জেলে ভাড়া করা লোকই আছে।'

'ধন্যবাদ অনিলদা, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।'

মুকুল ফোন ছেড়ে দিয়ে জমাদার জয়ন্তকে ডাকল। জয়ন্ত এক সেকশান ফোর্স রেডি করে আনলে আলিনগর সেন্ট্রাল জেলের সামনে ডিউটি বসিয়ে দিল। কিংকংয়ের

ছবিটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'এই লোকটা যাতে জেলের ভিতর না ঢুকতে পারে তা দেখতে হবে। ঢুকতে গেলেই ধরে নিয়ে আমাকে খবর দেবেন।'

জয়ন্ত ঘাড় নেড়ে সায় দিল। মুকুল কোয়ার্টারে গিয়ে তাড়াতাড়ি করে স্নান-খাওয়া করে থানায় ফিরল। গোপালের 'রিমাণ্ড'টা লিখে রাখবে ভাবছিল, টেলিফোনটা বেজে উঠল। ডিউটি অফিসার সামাদ রিসিভারটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'স্যার, ডি সি সাহেব আপনাকে চাইছেন।'

মুকুল ভয় পেল, ডি সি-ও বোধ হয় গোপালকে ছেড়ে দিতে বলবে। বললে সে কি বলবে সেটা ভাবতে ভাবতে ফোন ধরে বলল, 'নমস্কার স্যার, মুকুল বলছি।'

'নমস্কার। আবার কি কারবার শুরু করেছেন? আপনি কি আমাদেব কাউকে একদিনও শান্তিতে থাকতে দেবেন না?'

'কেন স্যার, আমি তো খারাপ কিছু করিনি।'

'খারাপ কিছু করেননি? সেন্ট্রাল জেলের সামনে গার্ড বসিয়েছেন কার হুকুমে?'

'কিন্তু তাতে তো কারও কিছু অসুবিধা হচ্ছে না স্যার।'

'সুবিধা-অসুবিধার কথা হচ্ছে না। আপনি বসালেন কেন বলুন?'

'কিংকংয়েব জায়গায় ওরা ভাড়াটে লোককে জেলে রেখেছে স্যার। কিংকংকে ধরব। তাড়াতাড়ি যাতে আবার জেলে ঢুকে না পড়ে তার জন্যই গার্ড বসিয়েছি স্যার।'

'আপনার ওপর কি সারা দুনিয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে? জেলের ভিতরে কি হচ্ছে সেটা দেখার অধিকার আপনাকে কে দিল?'

'জেলের ভিতর নয় স্যার। কিংকং বাইরে আছে। কিং...'

'কে কোথায় আছে শুনে আমার কাজ নেই। জেলের আই. জি. কমিশনারকে ব্যাপারটা জানিয়েছেন। উনি অত্যন্ত অ্যানোয়েড। আপনি ইমেডিয়েটলি ওখান থেকে গার্ড তুলে নিন। না হলে অসুবিধায় পড়বেন।'

ডি সি ফোন ছেড়ে দিল। মুকুল হতাশভাবে রিসিভারটা রাখছিল, ধীরেন এসে একটা স্লিপ দিল। স্লিপের নামটা দেখেই মুকুল আরও উত্তেজিত হয়ে পড়ল। কেন যে এগুলো তারই কাছে এসে জোটে? ক্ষুব্ধভাবেই পাঠিয়ে দেবার ইঙ্গিত করল। আজ পরিষ্কার বলে দেবে, তার পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব নয়। বিপ্লব এসে দাঁড়ালে নিস্পৃহভাবে বলল, 'বলুন, কি বলতে চান?'

বিপ্লব মুখটা নিচু করে জানাল, 'স্যার, কিংকং এসে সুরেশ সিংয়ের বাড়িতে ঢুকেছে।'

মুকুল তাড়াতাড়ি উঠে দরজাটা বন্ধ করে জিজ্ঞেস করল, 'তারপর?'

'আমি নজর রাখাব জন্য তিনজন ছেলে লাগিয়েছি। ওখান থেকে বেরিয়ে গেলে একজন আমাদের খবর দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে, দুজন ওকে ফলো করবে।'

'একদম পাকা ব্যবস্থা!' মুকুল আবেগে বিপ্লবের গালে চুমু খেয়ে দিয়ে বলল, 'আপনি স্পটে চলে যান। আমি কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছি।' কড়াং কড়াং করে বেল বাজিয়ে দফাকে বলল, 'কমল আর হারুনবাবুকে এক্ষুনি চলে আসতে বলুন।' হারুন এসে দাঁড়াতেই বলল, 'চার-পাঁচজন সিপাই নিয়ে এক্ষুনি গাড়িতে উঠুন। কাপড়-টাপর পাল্টাতে হবে না, শুধু দুটো রাইফেল আব কটা লাঠি নিয়ে

নেবেন।' মুকুল উত্তেজনায় বাইরে এল। কমলকে আসতে দেখেই বলল, 'রিভালবারটা নিয়ে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠুন। ধীরেন, ড্রাইভারকে বলুন তাড়াতাড়ি।' নিজেও পিস্তলটা কোমরে গুঁজে নিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে গাড়িতে বসল। আর সকলেও পড়িমড়ি করে ছুটে এল। মুকুল ড্রাইভারকে ইশারা করে বলল, 'ছ নম্বর খাসপাকুড়িয়া লেন।' গাড়ি চলতে লাগল। চলন্ত গাড়ির মধ্যেই মুকুল অভিযানের উদ্দেশ্য এবং করণীয় বুঝিয়ে বলল। গাড়ি এসে থামতেই মুকুল বিপ্লবের ইঙ্গিত পেল, কিংকং এখনও বাড়ির মধ্যেই আছে। হারুন তার লোকজন নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে বাড়িটা ঘিরে নিল। কমলকে সাক্ষী ডাকতে বলে মুকুল দরজার বেল বাজাতে লাগল।

অনেকক্ষণ পর দরজা খুলল সুরেশ সিং নিজে। কিছু না বোঝার ভান করে জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার?'

'থানা থেকে আসছি।'

'ও আচ্ছা আচ্ছা, আসুন আসুন, বসুন। কষ্ট করে কেন আসতে গেলেন? খবর দিলে আমি নিজে চলে যেতাম। এসেছেন খুব ভাল করেছেন। আসুন, বসুন।'

'না, আমরা বসবার জন্য আসিনি।'

'তা হলে?'

'আমাদের কাছে খবর, আপনার বাড়িতে আমাদের কেসের একজন আসামী ঢুকেছে। তাকে অ্যারেস্ট করার জন্য বাড়িটা সার্চ করতে হবে।'

'আপনারা কি সার্চ-ওয়ারেন্ট নিয়ে এসেছেন?'

'না, সার্চ-ওয়ারেন্ট ছাড়াই সার্চ করতে এসেছি। আইনে সে ক্ষমতা আমাদের দেওয়া আছে।'

'জানি আছে। কিন্তু কোর্টের অনুমতি ছাড়া তা না করার জন্য আমার কাছে হাইকোর্টের অর্ডার আছে।'

পকেট থেকে অর্ডারের কপিটা বের করে সে মুকুলের সামনে ধরল। মুকুল কপিটা নিয়ে পড়তে লাগল। পাঁচ বছর আগেকার 'ইন্টারিম অর্ডার', 'চার সপ্তাহের মধ্যে প্রতিপক্ষ এফিডেফিট জমা দেবে। তারপর এক সপ্তাহের মধ্যে দরখাস্তকারী উত্তর জমা দেবে। ছ সপ্তাহ পরে শুনানি হবে। ততদিন (এফ) আবেদন অনুসারে স্থগিতাদেশ থাকবে।'

কিন্তু এ তো ছ সপ্তাহের জন্য অর্ডার। পাঁচ বছর হয়ে গেছে। সুরেশ সিং আরও একটা অর্ডারের কপি তুলে ধরল, 'নোটিশ সার্ভ করা সত্ত্বেও সরকারের পক্ষে কেউ উপস্থিত নেই। শুনানি না হওয়া পর্যন্ত (এফ) আবেদন অনুসারে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে।'

(এফ) আবেদনে কি ছিল? সুরেশ সিং রিটের কপিটা তুলে ধরল। মুকুল পাতা উল্টে পড়তে লাগল, 'প্রতিপক্ষ বা তার কোন অধস্তন কর্মচারী, দরখাস্তকারী, তার কোন আত্মীয়স্বজন বা কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করতে পারবে না এবং তাদের বাড়ি বা কর্মস্থলে তল্লাসি চালাতে পারবে না।'

মুকুল আশ্চর্য হয়ে গেল। কোর্ট এরকম একটা অর্ডার দিয়ে রেখেছে? থানার ও সি থেকে কমিশনার হয়ে স্বরাষ্ট্রসচিব পর্যন্ত কোন প্রতিপক্ষ কিছু করেনি?

পাঁচ বছর ধরে 'ইন্টারিম অর্ডার' বহাল আছে? অর্ডারকে ঢাল করে সুরেশ সিং এবং তাব সাকরেদেরা সব রকম অপরাধ করে বেড়াচ্ছে। পুলিস ও প্রশাসনের লোকেবা সাফাই গাইছে. 'হাইকোর্টের অর্ডার আছে, আমবা কি করব?' কেউ তাদের জিজ্ঞেস করছে না, 'অর্ডারটা ভ্যাকেট কবার ব্যবস্থা তো করতে পার, সেটা কবছ না কেন?' তা হলে যে অর্ডাবের আড়ালে মাসোহারার অর্ডারটাও ভ্যাকেট হযে যাবে। প্রায় মাসখানেক হল সে থানার দাযিত্ব নিয়েছে, থানার কোন অফিসার তাকে এ অর্ডারের কথা বলেনি। বললে আজ এরকম মুশকিলে পড়তে হত না।

এখন জেলে বদলি বেখে বাইবে অপবাধ কবে বেডানো খুনের আসামী ধবতে গেলে অর্ডার অমান্য হয না। না ধরে ফিরে গেলে হাতের মুঠোয় পাওয়া আসামী না-ালের বাইরে চলে যাবে। লোকে ভাববে, বড়বাবু হাতে পেয়েও কিংকংকে ধরেনি। তারও থেকে বড় কথা, সুরেশ সিং যে হাইকোর্টের আড়ালে এরকম মারাত্মক অপরাধ কবছে এটা প্রমাণ হবে না।

'আপনি বোধহয় থানায় নতুন এসেছেন, নাহলে জানতেন, সুবেশ সিংয়েব বাড়িতে পুলিসের বেড হয না।'

কি স্পর্ধা! এটা অবশ্যই চূর্ণ হওযা দরকাব। মুকুল ঠিক করল, সে কিংকংকে ধরে নিয়ে যাবে। আদালত অবমাননার মামলা হলে, তখন এ প্রশ্নও তোলা যাবে যে দীর্ঘ পাঁচ বছব ধবে এরকম একটা আদেশ দিয়ে রেখে অপবাধ করাব সুযোগ করে দেওয়া কাম্য কিনা। নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বলল, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমি এ থানায নতুন। তা যখন এসেই পড়েছি, চলুন একবার বাড়ির ভিতরটাও দেখে যাই।'

'মানে?'

'মানে খুব পরিষ্কার। আমরা এখন বাড়ির ভিতরটা দেখব।'

'হাইকোর্টের অর্ডার আছে, যেতে পারেন না। আমি কন্টেম্পট অব কোর্ট করব।'

'করবেন। ওটা কোর্টে করতে হবে—এখানে নয়। এখন আপনি আমাদের সঙ্গে ভিতরে চলুন। কমল, সাক্ষীদের নিয়ে আসুন। আর সিংকে একটু ভিতরে যেতে সাহায্য করুন।'

সুরেশ সিং তখনও 'কন্টেম্পট অব কোর্ট কবব', 'কন্টেম্পট অব কোর্ট করব' বলে খুব লম্ফঝম্প করছিল। কমল এসে এক ধাক্কায় বাড়ির ভিতর ঢুকিয়ে বলল, 'যখন যা করবি করিস, এখন বড়বাবু যা বলছেন তাই কর।' সিং সঙ্গে সঙ্গে চুপসে গিয়ে সিং গুটিয়ে নিল। চুপচাপ টুকটুক করে চলতে লাগল। বেশি দূর যেতে হল না, দেখা গেল বসার ঘরেই কিংকং মদের বোতল নিয়ে বসে আছে। মুকুল ধড়ে প্রাণ পেল। এবপর আর যাই হোক সে তার মুখোমুখি হতে পারবে। না পাওয়া গেলে মুশকিল ছিল।

কিংকিং কিছু বোঝার আগেই কমল গিয়ে জাপ্টে ধরল। মুকুল সদর দরজার কাছে গিয়ে হারুনদের ডাকল। হারুন এসে হাতকড়া পরিয়ে দিল। দুজন সিপাই কিংকংয়ের দায়িত্ব নিল। মুকুল একটা 'নিল' সিজার লিস্ট করে নিয়ে সুরেশ সিংকে বলল, 'চলুন আপনাকেও অ্যারেস্ট করা হল।'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ, আপনাকে। যে টানে জেলের লোক বাড়িতে চলে এল সে টানে বাড়ির লোক কিছুদিন জেলে যাবে না?'

কমল এসে সুরেশ সিংকে নিয়ে চলতে লাগল। ততক্ষণে সুরেশ সিংয়ের স্ত্রী এবং অন্যান্য লোকজন চলে এসেছে। তারা বারবার বলতে লাগল, 'ওনাকে কেন নিয়ে যাচ্ছেন? উনি তো কিছু করেননি।'

'উনি কি করেছেন সেটা বোঝানোর জন্যই নিয়ে যাচ্ছি। চলুন।'

কমলরা চলতে শুরু করল। রাস্তার দু' পাশে এলাকার উৎসুক লোকেরা দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, হাতে হাতকড়া পরা কিংকং এবং তার রক্ষাকর্তা সুরেশ সিংকে পুলিস ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

থানায় পৌঁছে মুকুল বলল, 'সিংকে সোজা হাজতে ঢুকিয়ে দিন, আর কিংকংকে আমার কাছে নিয়ে আসুন।'

জিজ্ঞাসাবাদ করে যে মুহূর্তে মুকুল কিংকংয়ের পরিচিতি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হল সেই মুহূর্তে সি পি এবং ডি সি-র কাছে গ্রেপ্তারের কথা জানিয়ে মেসেজ লিখল। মেসেজের কপি জেলের আই জি-র কাছেও পাঠিয়ে দিল যাতে তিনি ইচ্ছে করলে আচমকা জেলে গিয়ে নকল কিংকংকে দেখে নিতে পারেন। আসল কিংকংকে নিয়ে সে ডি সি অফিসে হাজির হল। ভাল করে একটা স্যালুট ঠুকে খুশিমুখে বলল, 'কিংকংকে ধরে এনেছি স্যার।'

'ধরে এনেছেন মানে? জেলের ভিতর থেকে ধরলেন কি করে?'

'আমি তো স্যার এইটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে ও জেলের ভিতর নেই, বাইরে আছে—আমার কথা তো আপনারা কেউ মানতে চাননি। এখন ওর নিজের মুখ থেকেই শুনুন। ওকে ভিতরে নিয়ে আসব স্যার?'

'ঠিক আছে, নিয়ে আসবেন। তার আগে ব্যাপারটা খুলে বলুন তো।'

'স্যার, সুরেশ সিংয়ের কথামতই খুন করে কিংকং জেলে গিয়েছিল। সুরেশ সিংয়ের দু নম্বর কারবার চালু রাখার জন্যই ওকে বাইরে আনার ব্যবস্থা হয়। মালোপাড়ার সনাতন এককালীন দশ হাজার টাকা এবং মাসে মাসে দু হাজার টাকার জন্য কিংকংয়ের হয়ে জেল খাটছে।'

'তা হলে তো সাংঘাতিক ব্যাপার। কমিশনারকে জানাতে হবে। ওদের আই জি উল্টো চোটপাট করছিল।'

ডি সি ফোন তুলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় দফা এসে বলল, 'স্যার বলতে বললেন, অ্যাডভোকেট সমর ব্যানার্জী এসেছেন।'

'আসতে বলুন।'

দফা বাইরে গেল। কালো শামলা পরা একজন লোক ঢুকে অভিবাদন জানাল, 'গুড আফটারনুন স্যার। আমি অ্যাডভোকেট সমর ব্যানার্জী। একটা জরুরি দরকার আছে, তাই নিজেই আসতে হল। আর আপনার সঙ্গে একবার দেখাও হয়ে যাবে। তবে পাইকারীবাজার থানায় এমন ও সি বসিয়েছেন যে সে নিজে তো জেলে যাবেই, আপনাদেরও না পাঠিয়ে ছাড়বে না। কিছু মনে করবেন না, বাধ্য হয়ে আপনাকে একটা চিঠি ধরাতে হচ্ছে। আমরা আপনাদের এগেনস্টে হাইকোর্টে কন্টেম্পট অব

কোর্ট পিটিশান ফাইল করছি।' একটা চিঠি ডি সি-র হাতে দিযে বসে পড়ল। চিঠিটার ওপর চোখ রেখেই ডি সি-র মুখের চেহারা বদলে গেল। শামলা-পরা আব্বারের ভঙ্গিতে বলে চলল, 'হাইকোর্টের ক্লিয়ার অর্ডার আছে যে, কোর্টের লিভ ছাড়া সুরেশ সিংকে অ্যারেস্ট করা যাবে না। আপনার ও সি তা সত্ত্বেও ওনাকে ধরে এনে বেআইনীভাবে হাজতে আটকে রেখেছে। দেখুন আপনি কি করবেন। আমরা কোর্টে যাচ্ছি।' সে হ্যান্ডশেক করে বেরিয়ে গেল।

ডি সি মুকুলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি সুরেশ সিংকেও অ্যারেস্ট করেছেন?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'কিন্তু ওরা যে বলছে, ওকে অ্যারেস্ট না করার জন্য হাইকোর্টেব অর্ডার আছে?'

'হ্যাঁ স্যার, সুরেশ সিংও বলছিল। কিন্তু ওরকম একজন জঘন্য অপরাধীকে অ্যারেস্ট না করার ওরকম অর্ডার কোর্ট দিতে পারে?'

'কোর্ট কি কবতে পারে না পারে সে বিচার আপনি করবেন, না আপনি কি করতে পারেন না পারেন সে বিচার কোর্ট করবে?'

'ঠিকই বলছেন স্যার। কিন্তু কিংকংয়ের সঙ্গে যখন নিজের বাড়িতে একসঙ্গে ধরা পড়েছে তখন কোর্ট নিশ্চয় পরিস্থিতি বিচার করে রায় দেবে।'

'হ্যাঁ, শুনলেন তো, বিচার করে জেলও দিতে পারে। আচ্ছা, কাজকর্ম করার সময় কি আপনার মাথার ঠিক থাকে না, না ভূত-ভবিষ্যৎ কিছু চিন্তা করেন না? নাহলে এরকম দুমদাম যা খুশি তাই করেন কি করে? যান, তাড়াতাড়ি সুরেশ সিংকে ছেড়ে দিয়ে একটা মিটমাট করে নিন। নাহলে আপনার জন্য আমাদেরও জেলে যেতে হবে।'

মুকুল ভাবছিল, কিংকংকে অ্যারেস্ট করার জন্য ডি সি তার কাজের প্রশংসা না করে পারবে না, কিন্তু পুরস্কারের বদলে তিরস্কার পেয়ে সে মনকে আরও শক্ত করে নিল। দৃঢ়ভাবে মোলায়েম করে উত্তর দিল, 'স্যার, আপনারা কেউ আমাকে এ কাজ করতে বলেননি। কোর্টকে এ কথা জানিয়ে দিলে আপনাদের বিরুদ্ধে আর কোন বক্তব্য থাকবে না। শুধু আমাকে শেষ পর্যন্ত কি হয় দেখার অনুমতি দিন। তার জন্য যদি আমাকে জেলে যেতে হয় যাব।'

'ঠিক আছে, আপনি যা ভাল বোঝেন করুন। আমি কমিশনারকে জানিয়ে রাখব।'

মুকুল স্যালুট করে বেরিয়ে এল।

থানায় পৌঁছে দেখল, ঐ শামলা-পরাটা বসে আছে। চেয়ারে বসতেই ধীরেন একটা চিঠি নিয়ে এসে বলল, 'স্যার, মেজবাবু আপনাকে দিতে বললেন।' মুকুল নিয়ে দেখতে লাগল। উকিলের চিঠি, 'আমার মক্কেল, সুরেশ সিংকে আপনি মহামান্য উচ্চ আদালতের মাননীয় বিচারক প্রভুদয়াল গুপ্তের আদেশ লঙ্ঘন করে গ্রেপ্তার করেছেন। এর জন্য কেন আপনার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করা হবে না, তা জানাতে বলা হচ্ছে। এই চিঠি পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে কোন উত্তর না পাওয়া গেলে ধরে নেওয়া হবে যে আপনার কিছু বলার নেই।' শ্যামল রায় নামে একজন উকিল লিখেছে। তা হলে সমর ব্যানার্জী কি শ্যামল রায়ের জুনিয়র? মুকুল

হাতে নিয়ে দেখল, শামলা-পরা সমর ব্যানার্জীর স্লিপ। ধীরেনকে আসতে বলার ইঙ্গিত করে অপেক্ষা করতে লাগল। শামলা-পরা ঘরে ঢুকে নিজের পরিচয় দিল, 'আমি অ্যাডভোকেট সমর ব্যানার্জী।'

'বসুন।'

শামলা-পরা বসল। মুকুল বোঝার চেষ্টা করছিল ও মুকুলকে ডি সি-র ঘরে খেয়াল করেছে কি না। একজন আইনজীবী হিসেবে ওরকম কথা বলার আগে ঘরে আর কে কে আছে সেটা তার দেখে নেওয়ারই কথা। কিন্তু তাকে দেখে মনে হচ্ছে না যে সে মুকুলকে আগে দেখেছে। অন্তত সেরকম কিছু বোঝাতে চাইছে না। ডি সি-কে বলা তার কথাগুলো যেন এখনও মুকুলের কানে বিঁধছে। মেজাজটাকে নিয়ন্ত্রণ করে মুকুল বলল, 'বলুন, আপনার জন্য কি করতে পারি?'

'আমি সুরেশ সিংয়ের বেল নিয়ে এসেছি।'

'আপনি নিশ্চয় জানেন যে তার অপরাধ জামিন-অযোগ্য, তাকে জামিন দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই।'

'আমার ক্লায়েন্ট অসুস্থ। অসুস্থ লোককে নন-বেলেবল কেসেও বেল দেওয়ার ক্ষমতা আপনার আছে?'

'সুরেশ সিং আবার অসুস্থ হল কবে থেকে?'

'অনেক দিন থেকে। হার্টের পেশেন্ট। দু-দুবার অ্যাটাক হয়ে গেছে। এই যে আপনার কাছে আমরা বেলের জন্য যে দরখাস্ত করেছি তার সঙ্গে প্রেস্ক্রিপশানের কপি অ্যাটাক করে দিয়েছি।'

মুকুল কপিটা নিয়ে দেখল, শহরের এক নামকরা হৃদরোগ-বিশেষজ্ঞের ব্যবস্থাপত্র। প্রথম তারিখ তিন বছর আগেকার। কেমন যেন সন্দেহ হল। এরকম ব্যবস্থাপত্র আগে থেকে থাকলে সুরেশ সিং, তার স্ত্রী বা বাড়ির লোকজন বাড়ি থেকে আনার সময়ই না দেখিয়ে থাকত না। বলল, 'অরিজিনাল কপিটা একটু বের করুন।' শামলা-পরা কপিটা বের করে দিল। মুকুল নিয়ে দেখল, একদম নতুন কড়কড়ে কাগজ। সদ্য ভাঁজ করা। লেখাটাও টাটকা। চালাকি করে বিভিন্ন তারিখ দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন কালিতে লেখা। মুকুলের খারাপ লাগল। সমাজের তথাকথিত সম্ভ্রান্ত পেশার অধিকাংশ লোকেরাও কুকুরের মতো লোভী এবং পা-চাটা হয়ে গেছে। এক টুকরো মাংস দেখালেই যেমন কুকুর ছুটে এসে লেজ নাড়ে আর পা চাটে, পরিমাণমত 'চাঁদির জুতো' ছুঁড়ে মারলেই এরা 'দাসানুদাস তস্য দাস' হয়ে যা বলা যায় তাই করে। কুকুর তবুও নিজের প্রভুর প্রতি অনুগত হয়, এরা নিজেদের পেশার প্রতিও অনুগত নয়। কিন্তু আমিও ছাড়ব না, মুকুল মনে মনে ভাবল, 'হ্যান্ড-রাইটিং একসপার্টের কাছে পাঠিয়ে পরীক্ষা করাব, করেকার লেখা। রিপোর্টের ওপর কেস স্টার্ট করব। মেডিকেল কাউন্সিলেও চিঠি পাঠাব। তখন বুঝবে ফলস প্রেস্ক্রিপশান করার কি ফল। কাগজ নিয়ে একটা সিজার-লিস্ট করে বলল, 'এই প্রেস্ক্রিপশানটা আমি সিজ করলাম। আপনার কাছ থেকে সিজ হল, কাজেই আপনার সিজার-লিস্টের একটা কপি পাওনা। নিন সই করুন।'

'আমি সই করব না।'

'তা হলে সেটা সিজার-লিস্টে লিখে রাখব। আপনি কোন কপিও পাবেন না।'

'আপনি বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন। বেআইনী কাজ করছেন। এর...'

'অ্যাডভোকেট যখন, সি আর পি সি নিশ্চয় পড়েছেন। আরেকবার দেখে নিন, এ ব্যাপারে আইনটা কি? তার পরেও যদি মনে হয়, আমি বেআইনী কাজ করছি, আমার নামে মামলা করুন।'

'তাই করব। কন্টেম্পট অব কোর্ট করব। এ ব্যাপারে আপনার নামে একটা নোটিস্ আমরা অলরেডি পাঠিয়েছি।'

'আমি তার উত্তর লিখে রেখেছি, আপনি কি উত্তরটা নিয়ে যেতে চান?'

'নিশ্চয়।'

'তা হলে প্রাপ্তি স্বীকাব করে সই করুন।'

'আমি সই করব কেন, তার জন্য আমাদের মুহুরি আছে।'

'তা হলে মুহুরিই উত্তরটা নেবে। আপনার আর কোন বক্তব্য না থাকলে আসতে পারেন।'

প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট হয়ে, দাঁত কিড়মিড় করে, 'দেখে নেব' এটা ভাবে-ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়ে শামলা-পরা বিদায় নিল।

মুকুল মাথা ঠাণ্ডা করে মামলাটা ভাল করে সাজাতে লাগল। পূর্বাপর ঘটনা লিপিবদ্ধ করে 'রিমান্ড' লেখালো। যতটা সম্ভব সাক্ষী-প্রমাণ যোগাড় করালো। কেস-ডায়েরি আপ-টু-ডেট করলো। তদন্তকারী অফিসারকে নিয়ে পরের দিন শুনানির সময আদালতে উপস্থিত থাকল। এত করেও সুরেশ সিংকে আটকানো গেল না। কোর্টে ওর অসুস্থতাব কথা তুলল না বটে, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট শুধুমাত্র হাইকোর্টের অর্ডাব দেখে, আর কোন কথা না শুনেই সুরেশ সিংকে জামিন দিয়ে দিল।

যাদের অনেক পয়সা আছে তাদের কিছুতেই আটকে রাখা যায় না! আটকে থাকে মুস্তাকিম আর রীতা বোসরা যাদের না আছে পয়সা, না আছে প্রভাব!

রীতার পুলিস হাজতের মেয়াদ কাল শেষ হচ্ছে। পুলিস কিছু না চাইলেও ম্যাজিস্ট্রেট তাকে জেল হাজতে পাঠিয়ে দেবে। যদি আসল অপরাধীকে এর মধ্যে ধরা যেত! মুকুল অমলবাবুকে ডেকে পাঠাল। অমলবাবু এসে জানালেন, 'স্যার, কমল তেমন কোন খবর যোগাড় করতে পারেনি, তবে বিশ্বনাথ কিছুটা যোগাড় করেছে।'

'বিশ্বনাথ?'

'হ্যাঁ স্যার, আপনি সেদিন বকার পর থেকে, ভয়ে হোক ভক্তিতে হোক, ও ভালভাবে কাজকর্ম করছে। এ ব্যাপারেও খোঁজখবর যোগাড় করেছে।'

'কি খবর যোগাড় করেছে?'

'স্যার, নরেশ পাল এলাকার কয়েকজন আসক্তের মাধ্যমে পাতা বিক্রি করাচ্ছে। ওরা খুব সকালে বা অনেক রাতে নরেশ পালের সঙ্গে দেখা করে। নরেশ পাল জনা চারেক লোকের সঙ্গে রেগুলার দেখা করছে। তার মধ্যে পবন যোশী একজন। নরেশ এসে প্রথমে যোশীর হোটেলে ঢোকে। খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে যোশীর কাছে চলে যায়। ভিতরটা হোটেলে বসেও দেখা যায় না। সেজন্য ওরা ভিতরে কি করে তা জানা এখনও সম্ভব হয়নি।'

'ওদের কোন লোককে টোপ দেওয়া যায় না?'

'যায় স্যাব। কিন্তু টোপ না গিললে আমাদেব প্রচেষ্টাব কথা ওর কানে পৌঁছে যাবে।'

'তা ঠিক। ওব বাড়ি থেকে বেরুনোর পর নরেশকে সার্চ করেও দেখা যায়, কিন্তু সেক্ষেত্রেও যোশীকে ধরা যাবে না। আপনি একটা রেইড অর্গানাইজ করুন, নরেশ যোশীর কাছে যাওয়াব পবই আমবা হানা দেব। একটা রিস্ক নিতেই হবে, কিছু কবার নেই।'

'ঠিক আছে স্যাব। আমি বিশ্বনাথকে লাগিয়ে রাখছি, খবব পেলেই আপনাকে জানাব।'

অমলবাবু চলে গেলেন। মুকুল ভারাক্রান্ত মনে কোয়ার্টার রওনা হল।

খাড়া দুপুব বাবোটার সময় অমলবাবু ফোনে জানালেন, নরেশ হোটেলে ঢুকেছে। মুকুল থানায় এসে অপেক্ষা কবতে লাগল। বিশ্বনাথেব ফোন আসতেই লোকজন নিয়ে রওনা হয়ে গেল। চারিদিকে লোক দাঁড কবিয়ে হোটেলের দিককার খোলা দরজা দিয়ে ঢুকতে গেল, কিন্তু ততক্ষণে ওবা ও দবজাটা বন্ধ কবে দিয়েছে। মুকুল ফিরে এসে সদর দরজার ঘণ্টা বাজাল।

মিনিট পনেব পরে গ্রিলে ঢাকা দবজা খুলল আঠের-উনিশ বছবেব এক যুবক। প্রচণ্ড বিরক্তি প্রকাশ করে জানতে চাইল, 'কি হয়েছে? অত অসভোব মত বেল বাজাচ্ছেন কেন?'

কথা শুনে মুকুলেব মেজাজ গরম হয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, ধবে দেয কযেক ঘা লাগিয়ে। হাতের নাগালে থাকলে হয় তো দিতও, কিন্তু গ্রিল তখনও আটকানো, অতি কষ্টে মাথা ঠাণ্ডা রেখে বলল, 'আমরা থানা থেকে আসছি।'

'থানা থেকে আসছেন তো কি হযেছে? দশ মিনিট ভদ্রভাবে অপেক্ষা কবতে পারেন না?'

মুকুলেব আব সহ্য হচ্ছিল না, পাশে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'কমল, মনে হচ্ছে ভাল কথায় কাজ হবে না। দেখুন তো, দেওয়াল টপকে বা দরজা ভেঙে কোন দিক দিয়ে তাড়াতাড়ি ঢোকা যায়। ঢুকে আগে এটাকে গাড়িতে তুলুন।'

'তুলুন বললেই হল? বাপের ঘরের আইন নাকি? তুলুন দেখি, কত ক্ষমতা!'

'ঠিক আছে। একটুখানি সবুব কর, তোমার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

মুকুল বাগে কাঁপছিল। অমলবাবু এগিযে এসে বললেন 'তুমি পবন যোশীব ছেলে তো? তোমার বাবা কোথায়?'

'সুদেব আঙ্কেলের সঙ্গে ফোনে কথা বলছে।'

মুকুল বুঝতে পাবে তাদের ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করার জন্যই ইচ্ছে কবে মন্ত্রীর নাম নিচ্ছে। অমলবাবু বললেন, 'গ্রিলের চাবিটা খুলে দাও।'

'আমার কাছে চাবি নেই।'

'কার কাছে আছে?'

'আমি জানি না।'

'তোমার বাবাকে ডাক।'

'আমার ডাকার দরকার নেই, আপনাদের দরকার থাকলে ডেকে নিন।'

অমলবাবু আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, মুকুল এগিয়ে এসে বলল, 'অমলবাবু, এরা মানুষের সন্তান নয়, এরা এই সব পয়সাওয়ালা পশুদের বাচ্চা যাদের সঙ্গে আবাব মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ অফিসারদের ঘনিষ্ঠতা আছে। এরা শত অপরাধ করলেও সাজা হয় না। থানায় নিয়ে গেলেই ঘনঘন ফোন আসবে। কোর্টে পাঠালেও ছাড়া পেয়ে যাবে। কাজেই আইনের ভয় এদের থাকে না। ভদ্রতা এবা শেখে না। শেখে শুধু ক্ষমতার ঔদ্ধত্য দেখাতে। এদের সঙ্গে কথা বলে কোন লাভ নেই। দেরি তো হয়েছেই. যান কোন হার্ডওয়ারের দোকান থেকে একজন মিস্ত্রি ডেকে নিয়ে আসুন।'

অমলবাবু চলে গেলেন। কমল এসে জানাল, 'স্যার, টপকে ঢোকাব কোন উপায নেই। সব ঘেরা। ঢুকতে হলে দবজা ভাঙতে হবে।'

'অমলবাবুকে মিস্ত্রি আনতে পাঠিয়েছি। গ্রিল ভেঙেই ঢুকব। যতক্ষণ না মিস্ত্রি আসে ততক্ষণ একজন কাউকে দরজার বেলটা টিপে দাঁড়িয়ে থাকতে বলুন। আমি ততক্ষণে কি পরিস্থিতিতে গ্রিল ভাঙতে হল, সেটা লিখে সাক্ষীদের দিয়ে সই করিয়ে নিই।'

অমলবাবু খুব তাড়াতাড়ি মিস্ত্রি নিয়ে এলেন। গ্রিল ভেঙে মুকুলরা ভিতরে ঢুকল। দরজায় দুজনকে পাহাবায় রেখে আর সকলে তল্লাসি শুরু করল। একটা শোবাব ঘরে সেই যুবককে পাওয়া গেল। মুকুলদের দেখে সে আবার ফুঁসে উঠল, 'পারমিশান না নিয়ে আপনারা কেন আমার ঘরে ঢুকেছেন?' মুকুল কিছু না বলে চুল ধরে দুই থাপ্পড় দিয়ে গাড়িতে তুলে দিল। অন্য একটা ঘরে নরেশ পালকে পাওয়া গেল। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নেওয়া হল। 'অফিস ঘরে' পবন যোশী বসেছিল, মুকুল তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আধ ঘণ্টা ধরে ঘণ্টা বাজাচ্ছি, দরজা খুলছেন না কেন?'

'দরওয়াজা কেনো খুলবে? হামি তো কৈ অপরাধ করলো না, ফিরভি আপলোগ জবরদস্তি কর রহে হ্যাঁয়। হামি তো মিনিস্টার সুদেরবাবুর সঙ্গে কথা করছি। লিজিয়ে. ওয়ে বড়াবাবুসে বাত করনা চাহতে হ্যাঁয়।'

মুকুলের আর সহ্য হচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল এটাকেও ঘাকতক দেয়, কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছু পাওয়া যায়নি। ওদিকে আবার মন্ত্রী ফোন ধরে বসে আছে। মন্ত্রীও হয়েছে যেমন! ড্রাগের কারবারীও রেইড পার্টির লোকেব সঙ্গে কথা বলার জন্য ফোনে ধবে দেয়। সে বলল, 'মন্ত্রীর সঙ্গে আমার কোন দবকার নেই। উনাব দরকার থাকলে থানায ফোন করে নিতে পারেন। ইচ্ছে করলে যেখানে খুশি ডেকেও পাঠাতে পারেন। কিন্তু রেইড করতে এসে একজন অপরাধীর কথামত কথা বলব না।'

'দেখিয়ে, ওয়ে আপসে বাতচিৎ কবনে নেহি চাহতে হ্যায়।...ঠিক হ্যায়।'

পবন যোশী ফোন রেখে দিল। মুকুল বলল, 'অনেক তো মন্ত্রী দেখালেন, এবার আলমারিব চাবিগুলো খুলুন—ভিতরে কি আছে দেখতে হবে।' যোশী আর কোন কথা না বলে সব খুলে দিল। মুকুলরা তন্নতন্ন করে খুঁজল, কিন্তু যেই মত আশা করা গিয়েছিল সেই মত হেরোইন পাওয়া গেল না। মুকুলের লোকেবা তো বাইরে পাহারা দিচ্ছিল। কেউ বাইরে যায়নি, কাউকে বাইরে কিছু ছুঁড়ে ফেলতেও দেখা যায়নি। তাহলে গেল কোথায়? প্রাচীরের ধারগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। দক্ষিণ-পূর্ব কোণার একটা

জায়গায় দেখা গেল, সদ্য-সদ্য কিছু পুড়ানো হয়েছে—ছাই পড়ে আছে। ঝাঁঝালো গন্ধ উঠছে। মুকুলের ভিতরটা হাহাকার করে উঠল। মিস্ত্রি আনতে যে দেবি হয়েছে, সেই সময়টা ওরা হেরোইনটা পুড়িয়ে ফেলতে ব্যবস্থা করেছে।

এখানেও বড়লোক হওয়া সুবিধা। কোন গরিবেব বাড়ি হলে সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে তাকে হেরোইন সমেত ধরে ফেলত। কম কবে দশ বছর জেল ও এক লাখ টাকা জরিমানা হত। সুরক্ষিত বাড়ি হওয়ায পুলিসকে বাইবে আটকে বেখে অপবাধেব প্রমাণটাই পুড়িয়ে দিল। ছাই মানে তো কার্বন। এই ছাই পরীক্ষা কবে কি বোঝা যাবে এটা হেরোইন ছিল কিনা? মুকুল জানে না, তবুও সে পুরো ছাইটা সিজ কবে নিল, যদি জানা যায়, তাহলে পবন যোশীকে ধবা যাবে। মুকুল আব দেবি না কবে থানায় এসে ছাইটা পরীক্ষা করতে পাঠিযে দিল। তারপর নবেশ পালকে জিজ্ঞাসাবাদ কবতে লাগল।

সন্ধ্যাবেলায় কমিশনারের অফিস থেকে মেসেজ এল, পবেব দিন বেলা এগাবটাব সময় কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। মুকুল ভাল করে ইস্ত্রি কবা পোশাক পরে গেল। 'করিডোর সার্জেন্ট' কমিশনারকে জিজ্ঞেস করে এসে যাবার ইঙ্গিত করল। মুকুল দরজার পাল্লা ঠেল ঢুকে স্যালুট কবে সাবধান হয়ে দাঁড়াল। কমিশনার ফাইল থেকে মুখ তুলে মুকুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বিশ্রাম।' মুকুল বিশ্রাম হয়ে দাঁড়াল। কমিশনার একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'তোমাকে থানায় পোস্টিং করাব সমযই আমি ডেকে বলেছিলাম, অনেকেই তোমার কাজকর্মে অসন্তুষ্ট, একটু বুঝেসুঝে চলো। এমন কিছু কোরো না যাতে আমার কাছে আবার কমপ্লেন আসতে না শুরু কবে—কিন্তু তুমি তাই করছ।'

'স্যার, আমি তো বুঝেসুঝেই কাজ করছি।'

'বুঝেসুঝে কাজ করছ? কাল পবন যোশীর বাড়িতে রেইড করতে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'কি পেয়েছ?'

'পেতাম স্যার, কিন্তু ওরা দরজা না খুলে অনেকক্ষণ বাইবে দাঁড় করিযে রেখেছিল, আব সেই সুযোগে পুবো হেরোইনটা পুড়িযে দিযেছিল।'

'মানছি, হতে পারে। কিন্তু মন্ত্রী যখন তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন, তখন কথা বলে নিলে এমন কি ক্ষতি হত?'

'স্যার, ক্ষতি কিছুই হত না। কিন্তু আমি ড্রাগেব কাববারীকে ধবতে গিয়েছি। মন্ত্রী এত শস্তা হবেন কেন যে, সেই ড্রাগ-কারবারী তাঁকে ফোনে ধরে আমাকে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলবে? তাঁব কিছু বলার থাকলে আপনাকে ফোন কবতে পারতেন। ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছাড়া একজন মন্ত্রী আমাব মত একজন অত্যন্ত নিম্নপদাধিকারীকে ফোনে চাইবেন কেন?'

'বুঝলাম, কথা না বলার পেছনে তোমার যুক্তি আছে। কিন্তু যোশীব ছেলেটাকে মারধোর করার কি যুক্তি দেখাবে?'

'স্যার, আপনাকে মিথ্যা কথা বলব না, দুয়েকটা চড়-থাপ্পড় মারা হয়েছে। কিন্তু ও আমাদের সকলের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে, কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।'

'বুঝিয়ে বলতে পারতে।'

'স্যার, যে বুঝতে চায় তাকে বোঝানো যায়, কিন্তু যে কিছুই বুঝতে চায় না তাকে বোঝানো যায় না। আর পবন যোশীর মত যাদের কোন মন্ত্রী বা আপনাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে তাদের ছেলেমেয়েবা যে আমাদের মত জুনিযর অফিসারদের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করে সেটা আমি আপনাকে কি করে বোঝাব?'

'আমি সবটা না হলেও কিছুটা বুঝি। কিন্তু লাভ কি হল? ওরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করেছে, মানবাধিকাব কমিশনে চিঠি পাঠিয়েছে।'

'স্যাব আমাব কাগজ-কলম সব ঠিক আছে। সঠিক সাক্ষী আছে। অনুসন্ধান হলে আসল কথা প্রকাশ পাবে। কর্তব্যপালনে বাধা দিতে প্রযোজনীয় বলপ্রয়োগ করার অধিকাব আইনে আমাদের দেওযা আছে। আমাদের কিছু হবে না।'

'তা হয়তো হবে না, কিন্তু যতদিন না অনুসন্ধান শেষ হচ্ছে ততদিন একটা না একটা বায়নাক্কা লেগেই থাকবে। দেখ মুকুল, মাই হ্যান্ড ইজ অলরেডি ফুল উইথ প্রবলেমস। আই ডোন্ট উযান্ট মোর প্রবলেমস টু বি ক্রিয়েটেড বাই ইউ।'

মুকুল বুঝল, কমিশনার সাহেব খুবই বিরক্ত হয়েছেন। হয়তো তিনি আর মুকুলকে থানায় রাখতে চাচ্ছেন না বা পারছেন না। এরকম অবস্থায় কি বলা যায়? সে চুপ করে দাঁড়িযে থাকল। একটু থেমে কমিশনার সাহেব নিজেব বক্তব্যকে যেন গ্রহণযোগ্য করার জন্য বললেন, 'দেখ, তোমার মত তো আরও অনেক অফিসার আছে। তারাও কাজ করছে। কোন গণ্ডগোল হয় না। তুমি যেখানে যাও সেখানেই গণ্ডগোল হয় কেন?'

এই প্রশ্নটার উত্তর মুকুল নিজেও অনেকবার খুঁজেছে। এখন উত্তরটা অনেকটা জানা। কমিশনার সাহেবকে সেটা বলবে? বলে কি লাভ? না বলেও তো কোন লাভ নেই। তাহলে না বলে পস্তানোর থেকে বলে পস্তানোই ভাল। মুকুল মুখটা নিচু করে বলল, 'স্যার, আমার কি মনে হয় বলব?'

'বল।'

'স্যাব, সাট্টাওয়ালারা সাট্টা চালাচ্ছে। তাদের ভাড়া করা লোক আর তুলে দেওয়া প্যাড-পযসা নিয়ে অন্য অফিসাররা কেস করছে। সাট্টাও চলছে, কেসও চলছে। উভয় পক্ষ খুশি আছে। কোন গণ্ডগোল হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। আমি মুস্তাকিমদের মত ভাড়া করা লোকদের পরিবর্তে সীতারামদের মত আসল লোকদের না ধরতে গেলে গণ্ডগোল হত না।

'পবন যোশীরা ড্রাগের কারবার চালাচ্ছে। অন্য অফিসাররা রীতা বোসদের মত দুয়েকজন পেডলার বা ক্যারিয়ার ধরে কেস করছে, কারবার চলছে, কেসও চলছে। সকলেই খুশি আছে। খোঁজখবর নিয়ে পবন যোশীদের না ধরতে গেলে গণ্ডগোল হত না।

'সুরেশ সিংরা নিজেদের বেআইনী কারবার চালু রাখার জন্য কিংকংদের নিয়ে খুন, রাহাজানি, দাঙ্গা করাচ্ছে। কোর্ট থেকে পয়সা খরচ করে অর্ডার বের করছে। সে অর্ডার খালি করার কোন চেষ্টা হচ্ছে না। অর্ডারের আড়ালে যেমন সুরেশ সিংদের কালো কারবার চলছে তেমনি অফিসারদের বাঁ-হাতি কারবারও চলছে। বিপ্লবরা মার

খেয়েও প্রতিকার পাচ্ছে না, কিন্তু কোন গণ্ডগোল হচ্ছে না। আমি যদি অনেক কষ্ট করে খোঁজখবর নিয়ে কিংকংকে না ধরতাম, সুরেশ সিংকে হাজতে না পুরতাম, কোন গণ্ডগোল হত না।

'স্যার, আপনি যদি বুঝেসুঝে চলা বলতে ওরকম কিছু বুঝিয়ে থাকেন, তা হলে আমি অক্ষম। আমি অনেক ভাবনা-চিন্তা করে দেখেছি, আমি ওরকম কবতে পাবব না।'

কমিশনার মুকুলের লম্বা বক্তৃতা শুনে বিরক্ত হয়ে থাকবেন। একটুখানি চুপ করে থেকে বললেন, 'ঠিক আছে। তুমি এসো।'

মুকুল বেরিয়ে এসে থানা বওনা হল।

থানাব গেটের কাছে আসতেই চোখে পড়ল, ছোটবাবু সামাদ আলি একটা ময়লা, ছেঁড়া কাপড় পরা সতের-আঠার বছরের ছেলেকে তাড়াবাব চেষ্টা কবছে : 'যা ভাগ, আজ কিছু হবে না।' ছেলেটি কাকুতি-মিনতি করছে, 'দিন না বাবু, একটা কেস দিয়ে দিন না।' মুকুল ভাবল, ছেলেটি হয়ত অভিযোগ লেখাতে এসেছে। ছোটবাবু লিখতে চাইছেন না, তাড়িযে দিচ্ছেন। ভারি অন্যায। সে তাড়াতাড়ি এগিযে গেল, 'এই যে সামাদ সাহেব, কি হয়েছে?'

'যত সব ভিখিরিব দল স্যার। এসে বলছে, হাজতে রাখতে হবে।'

'কেন?'

'রাতের খাবাবটা মাংনা হয়ে যাবে স্যার।'

মুকুলের ভিতরটা কিবকম কবে উঠল। ছেলেটিকে ইশারায কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি হাজতে যেতে চাইছ কেন?'

'স্যার, হাজতে রাখলে আপনারা খেতে দেবেন। বাইরে থাকলে তো দেবেন না।'

মুকুল আর ভাবতে পাবছিল না, এই হচ্ছে তার দেশের বহুসংখ্যক দরিদ্র মানুষের অবস্থা। একবেলা খাবারেব জন্য যেখানে মানুষ যে কোন মামলার আসামী হতে চায় সেখানে আইন তাদের কী সমানাধিকার দেবে? আইন তাদের শুধু শাস্তি দেয়। পয়সা দিয়ে ধনী লোকেরা সব আইন কিনে নেয়।

বেঁশো ভূত

এক

শিবনগর গ্রামে ভূতের উপদ্রব খুব বেড়েছে। বিশেষ কবে গ্রাম থেকে ডোমকল যাবার বাস্তার পাশে মাঠের মধ্যে যে বড বাঁশঝাড়টা আছে সেখানে একদল বদখৎ ভূত-পেতনী আস্তানা গেড়েছে। আঁধার রাতে একা একা কোন পথচারীকে পেলে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছে। ছোট ছেলেমেয়ে পেলে তো তারা আরও মজা করে তাদের ঘাড় মটকাচ্ছে। ভূতের ভযে রাতের বেলা একাকী ওপথ দিয়ে হাঁটা একদম বন্ধ হয়ে গেছে।

এদিকে গ্রাম থেকে ডোমকল যাওযা-আসার ঐ একটিমাত্র পথ। আশেপাশের মধ্যে ডোমকলে একটিমাত্র বাজার। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে গ্রামের লোককে বাজাবে যেতেই হয়। অপ্রয়োজনে যাওয়া বন্ধ করা যায়, কিন্তু প্রয়োজনে যাওয়া বন্ধ করবে কি করে? কারও বাজাব করতে গিযে দেবী হয়ে গেছে, তাকে বাড়ী ফিরতেই হবে, কারও বাড়িতে রাত্রিতে হঠাৎ অসুখের বাড়াবাড়ি, তাকে ডাক্তার ডাকতে যেতেই হবে, কারও স্কুলে পুরস্কার বিতরণী তাকে বাড়ি ফিরতেই হবে, কারও যুক্তি করে বাজাবে গিয়েও কি করে বন্ধুর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি—তাকেও একাকী বাড়ী ফিরতেই হবে আর ভূত-পেতনীগুলো ঠিক তখনই ওদেব ধরবে।

দুই

ধরার জন্য পেতনীগুলো দারুণ এক ফন্দি বের করেছে।

'কিরকম ফন্দি?' গ্রামের শিবমন্দিরের পুরোহিত বৃদ্ধ রামকমল ভট্টাচার্য জিজ্ঞেস করলেন।

সমবেত লোকদের মধ্যে সমর মণ্ডল বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারে। সকলের পক্ষ থেকে সে উত্তর দিল, 'বাঁশঝাড়ের যে কয়েকটি বাঁশ রাস্তার ওপর হেলে আছে, পেতনীগুলো তার ওপব সাদা কাপড় পরে বসে থাকছে।'

'তারপর?'

'রাতের বেলা একলা কোন লোক পেলেই ধরছে।'

'কি করে ধরছে?'

তোতলা রমেন উত্তেজনায় অধীর হযে পড়ল, 'তে-তে-তে-তে-তে-তে—তেইখা-খা-খা-খা-খানেই তো ফো-ফো-ফো-ফো-ফোন্দি!'

ভটচায মশাই হাসতে হাসতে আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তা ফন্দিটা কি, সেটা তো বল!'

সমর রমেনকে নাড়া দিয়ে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'এই রমেন, একটু থাম না বাবা, আমি বুঝিযে বলছি। এই কতকগুলো বাঁশ তো রাস্তার ওপব নুইয়ে আছে?'

'আছে।'

'বাস্তা দিয়ে আসতে হলে হয় বাঁশটা উঁচু করে তুলে নীচে দিয়ে গলে আসতে

হবে, নয় নীচের দিকে চেপে ধরে ডিঙিয়ে আসতে হবে।'

'হবে। এতে ফন্দিব কি হল?'

'নীচু হয়ে গলে আসতে গেলে পেত্নীগুলো বাঁশের ওপর চড়ে চেপে ধরছে। আবার বাঁশের ওপর দিয়ে ডিঙিয়ে আসতে গেলে বাঁশসমেত চ্যাংদোলা করে তুলে ধপাস করে ফেলে দিচ্ছে।'

'না, তা হলে তো ভারী বিপদের কথা।'

'নাহলে আর আপনার কাছে এসেছি কেন? আপনি এই ভূতগুলো তাড়ানোর একটা বিহিতব্যবস্থা করুন।'

ভটচাযমশাই একটু ভেবেচিন্তে নিয়ে বললেন, 'প্রেতাত্মা যখন কোথাও একবার ভর করে তখন তাকে তাড়ানো ভারী শক্ত কাজ বাবা। তারপর সব শুনে যা মনে হচ্ছে, এ ব্রহ্মদৈত্য। হরেন ঘোষালের বৌটা অপঘাতে মল। তা ঘোষাল শ্রাদ্ধশান্তি তো ভালভাবে করল না। বেলগাছটা আশ্রয় করে ছিল, তা ঘোষাল বেলগাছটাও কেটে ফেলল। এখন মনে হচ্ছে আশ্রয়চ্যুত হয়ে ওটা ঐ বাঁশঝাড়েই আশ্রয় নিয়েছে। তা তোমরা সবাই মিলে ঘোষালকে বল, ভালভাবে শ্রাদ্ধশান্তি করুক। তাহলেই বৌটার আত্মা শান্তি পাবে, কুপ্রভাবও কেটে যাবে।'

তিন

সকলে মিলে হরেন ঘোষালের বাড়ী গেল।

ঘোষাল তো শুনেই রেগে আগুন, 'ইয়ার্কি মারার জায়গা পাও না? আমার বৌ মরে পেত্নী হয়েছে? তাও আবার বাঁশঝাড়ের আগলেতে? তাতেও ক্ষান্ত হয়নি, ভটচাযের কানে কানে বলতে এসেছে? থাম, তোমাদের সবকটার চাবকে ভূত ছাড়িয়ে দিচ্ছি!'

ভূত ছাড়ানোর জন্য অবশ্য কেউ অপেক্ষা করেনি। পালিয়ে চাবুকের হাত থেকে বেঁচেছিল। এখন হাঁপাতে হাঁপাতে আবার ভটচাযের কাছে গেল। ভটচায বললেন, 'ঘোষালটা চিরদিনই ওরকম রগচটা। ঐ জন্যই বৌটার অকালে প্রাণ গেল। এখন দেশশুদ্ধ লোকেরও ভোগান্তি।'

'সেটা তো বুঝলাম।' সমর বলল, 'কিন্তু এখন এর বিহিত কি হবে?'

ভটচাযের কোন ভাবান্তর হল না। তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, 'আমার নির্দেশ আমি জানিয়েছি। এখন ঘোষাল যদি না করে, তোমরা কর।'

কথাটা সকলেরই মনে ধরল। তারা চাঁদা তুলে ভটচাযের বিধানমত ঘোষালের বৌয়ের শ্রাদ্ধ করল। ব্রাহ্মণ-ভোজন করানো হল। মন্ত্র পড়া হল। যাগ-যজ্ঞ হল। ধূপ-ধুনো জ্বলল। কিন্তু ভূতের উপদ্রব কমল না। পেত্নীগুলোর উৎসাহ যেন আরও বেড়ে গেল। আগে শুধু আঁধার-রাতে হত, এখন জ্যোৎস্না-রাতেও হচ্ছে।

চার

পালেদের পটলা সেদিন বাজারে পুতুল বিক্রি করতে গেছিল। পুতুল বিক্রি হতে একটু রাত হয়ে যায়। জ্যোৎস্না রাত বলে ভয় করেনি। ব্যাগভর্তি বাজার করে ফিরছিল।

বাজারভর্তি ব্যাগ নিয়ে ডিঙিয়ে তো আসতে পারে না, যেই নীচু হয়ে বাঁশের তলা দিয়ে গলে আসতে গেছে, অমনি পেতনীগুলো বাঁশের ওপর চড়ে চেপে ধরেছে। পটলা তো ভয়ে গোঁ-গোঁ করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গেছে। জ্ঞান ফিরলে দেখে, সাদা কাপড় পড়ে একটা মেয়ে বাঁশঝাড়ের দিকে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। রতন পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পটলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিরে পটলা? সত্যি কি না বল না?'

'একদম সত্যি।' পটলা শপথ করে বলল, 'পেত্নীডার গায়ে ধল কাপুড় ছিল মাইরি!'

'কি করা যায়?'

ওদিক থেকে তোতলা রমেন বলে উঠল, 'ও-ও-ও-ও-ওঝা!'

পাশের গ্রাম কালুপুরের কেউ কেউ বলে, আগে নাকি ঐ গ্রামটার নাম ছিল কালীপুর। ফাঁকু ওঁঝার কথা রমেন আগেও কয়েকবার তুলেছিল। কেউ পাত্তা দেয়নি। ভটচাযের বিধান ব্যর্থ হওয়ার পর পাত্তা না দিয়ে আর কোন উপায় ছিল না। সমরও সায় দিল, 'দেখা-ই যাক না। রতন তুই একবার যা।'

বতন গিয়ে ফাঁকু ওঝাকে ধরে নিয়ে এল।

পাঁচ

ফাঁকু ওঝা তার পেল্লাই ভুড়ি, ইয়া বড় বড় গোঁফ-দাড়ি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল আর কাঁধে একটা ময়লা মত ঝুলি নিয়ে এসে বাঁশঝাড়ের পাশে রাস্তার ওপর বসে ঝুলির মধ্যে থেকে এটা-ওটা বের করতে লাগল। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা ঘিরে ধরে ভূত কেমন জানতে চাচ্ছিল, ফাঁকু ওঝা বলল, 'ভূত-পেতনী বলে কিছু নেই বাবাসকল। উনারা সব জিন-পরী। আল্লা যেমন আমাদের সৃষ্টি করেছেন তেমনি উনাদেরও সৃষ্টি করেছেন। এই বাঁশঝাড়ে দেখছি একদল বদ জিনের আসর পড়েছে।'

'তা হলে কি হবে?'

'আমি এমন দোয়া পড়ব সব বাপ বাপ করে পালাবে।'

'কিন্তু আপনি চলে গেলেই তো আবার আসবে।'

'সে গুড়ে বালি। আমি সমগ্র গাঁয়ের সীমানা বন্ধন করে দিয়ে যাব।'

'কেমন করে?'

'দেখই না।'

ফাঁকু ওঝা কিছু বাঁশের শুকনো পাতা এবং খড়কুটো জড়ো করে আগুন জ্বালল। ঝুলি থেকে একটা ঝাড়ুর মত বের করে দোলাতে থাকল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করতে থাকল। ঝাড়ুর মত ওটা দোলাতে দোলাতে গাঁয়ের চারদিকে ঘুরল। তারপর আবার বাঁশঝাড়ের কাছে এসে আর একপ্রস্থ বিড়বিড় করে বলল, 'আপদ দূর হয়েছে!'

রতন-সমররা খুব খুশী হয়ে ভূতের ওঝাকে বিদায় করল। কিন্তু ভূত-পেতনীগুলোকে বিদায় করতে পারল না। ওগুলোর উৎসাহ যেন আরও বেড়ে গেল। সাঁঝের বেলাতেই দাপাদাপি শুরু করে দিল।

ছয়

সাহাদের সনাতন মহাজনের ঘর থেকে ফিরছিল। সবে সন্ধে হয়েছে। গাঁয়ের সীমানা বন্ধ করা হয়েছে। আর সবে আঁধার হয়েছে। সনাতন একটু নিশ্চিন্ত মনেই আসছিল। যেই না বাঁশটা ডিঙোনোর জন্যে পা বাড়িয়েছে, ভূতগুলো বাঁশটাকে সড়াৎ করে জোরে তুলে দিয়েছে। ফচকে ফটিক রসিকতা করে বলল, 'বাঁশের ঝাপটায় সনাতন যখন চিৎপটাং ভূতগুলো তখন দড়বড়াং!' সমর সনাতনের কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি করে বল তো, ঠিক কি হয়েছিল?'

'আমি তো পড়ে গেছি। খুব ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠেছি। দেখি একটা বড় বড় শিংওয়ালা ভূত এসে আমার বুকের ওপর বসেছে, সারা গায়ে হাত বুলোচ্ছে। আমি ভয় আবার চিৎকার করে উঠেছি। উঠে দেখি, কিছু নেই। আরও ভয় পেয়ে গেছি।'

ভয় পাবার মতই ব্যাপার। কিন্তু উপায় কি করা যায়?

পাশের গ্রামের পলক দাঁড়িয়ে ছিল, সে বলে উঠল, 'হাবু গোয়েন্দা ও ডাবু গোয়েন্দাকে ডাকলে হয় না?'

'তারা আবার কে?'

'ভূত ধরার গোয়েন্দা।'

'ধুস! ভূত আবার ধরা যায় নাকি?'

'না সমরদা, পটলডাঙ্গার রাজবাড়ীর ভূত ধরার গল্প শোননি? সত্যি ধরেছিল কিন্তু!'

সমরের ঠিক মনে পড়ছে না, তবে ছোঁড়াদুটোর খুব নাম ছড়িয়েছিল বটে। এমনি এমনি কি আর ছড়িয়েছিল? তা হলে ডাকা যেতে পারে। পলকের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'পলকভাই, তা হলে চল একবার তাদের কাছেই যাই।'

পলক রাজী হয়ে গেল। সমরের সঙ্গে গিয়ে হাবু গোয়েন্দা ও ডাবু গোয়েন্দাকে খুঁজে বের করল।

সাত

হাবু আর ডাবু এলে সমবেত ছেলেমেয়েরা বলল, 'কি করে ভূত ধর দেখাতে হবে!'

হাবু জানাল, 'আমাদের প্রথমে তদন্ত করে দেখতে হবে।'

'তদন্ত করে দেখতে হবে?' সমর ভ্রূ কুঁচকাল, 'ভূতের আবার কি তদন্ত হবে?'

'দেখুন না।' ডাবু সপ্রতিভ জবাব দিল, 'আমরা তো কিছু গোপনে করছি না। আমাদের কাজ একদম খুললাম খুললা! তবে এখন কোন প্রশ্ন করা যাবে না, ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

'তা হলে আমরা প্রথমে এমন কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলতে চাই, যারা ভূতের হাতে হেনস্তা হয়েছে। কেউ এখানে আছেন?'

'অনেকেই আছে।'

সমর প্রথমে পালেদের পটলাকে এগিয়ে দিল। পটলার কাছে সব শোনার পর হাবু জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, ধল কাপড় পরা মেয়েটা তো জঙ্গলে ঢুকে গেল। আপনার ব্যাগভর্তি বাজারের কি হল? সেগুলো ছিল?'

সমর ভেবে পেল না, ভূতের সঙ্গে বাজারের সম্পর্ক কি! কিন্তু কোন প্রশ্ন করা যাবে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

পটলা মনে করার চেষ্টা করল। ভূতের হাত থেকে যে প্রাণটা বেঁচেছে, তখন সেইটাই বড় কথা। বাজাবের কথা কে ভেবেছে? কিন্তু না, ছিল না। পটলা ভাল করে ভেবে নিয়ে উত্তর দিল, 'না গোয়েন্দাবাবু, ছিল না।'

'তা হলে ছিল না? আর কেউ?'

সমব কিছু না বলে সাহাদেব সনাতনকে এগিয়ে দিল। ডাবু তার কথা শুনে জিজ্ঞেস করল, 'শিংওয়ালা ভূতটা গায়ে হাত বুলিয়ে চলে যাবার পর আপনার পকেটে টাকাগুলো ছিল?'

'আর বলবেন না! ভূতের নাম করে আমি টাকাগুলো মেরে দিচ্ছি বলে দাদা কি অশান্তিটাই না করলেন!'

'কি কববে বলুন, দাদা জানেন, ভূতে শুধু ঘাড় মটকায়! তিনি তো জানেন না, ভূতে টাকাও নেয়! কিন্তু দেখছি, এখানকাব ভূতপেতনীগুলো টাকা নেয়, বাজারের ব্যাগও নেয়!'

'আবার চকলেটও খায়।' ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা বছর দশেকের ছোট্ট মেয়ে বলে উঠল।

হাবু তার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি করে জানলে বল তো?'

'দাদু আনছিল তো, ভূতগুলো কেড়ে নিয়েছে।'

'তাই? আমরা যখন ধবব, তুমি খুব কবে বকে দিও ভাই।'

আট

জিজ্ঞাসাবাদ শেষ কবে তারা বাঁশঝাড়েব কাছে গেল। নুইয়ে পড়া বাঁশগুলোকে পরীক্ষা করে দেখল। আশপাশের জঙ্গলে কি যেন খুঁজে বেড়াল। অবশেষে হতাশ হয়ে ফিবে সবাইকে জানাল, 'না, কিছু বোঝা গেল না।'

হতাশায় সবাই এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

হাবু-ডাবু তাদের বিখ্যাত টর্চ নিয়ে রাত্রিবেলাতেও বাঁশঝাড়ের দিকে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। কয়েকদিন আর কেউ ভূতের হাতে পড়েনি। তা, সে তো কাছে অন্য লোক থাকলেও ভূত আসে না! হাবু-ডাবু আছে, তাই আসছে না। চলে গেলেই আবার আসবে। তা হলে আর সমাধান কি হল?

সত্যিই কিছু হল না। কদিন পরে এসে হাবু-ডাবু জানিয়ে গেল, 'আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাদের দ্বারা হবে না।'

সমর বলার চেষ্টা করল, 'হবে না বললে তো হবে না! ভার নিয়েছ, কাজ তুলতেই হবে!'

পলক কাকুতি-মিনতি করল, 'তোমরা অন্তত আর একবার চেষ্টা কব।'

হাবু-ডাবু রাজী হল না। গাঁ ছেড়ে চলে গেল।

নয়

পরের রাতেই মণ্ডলদের নয়ন ভূতের হাতে নাকাল হল। তার পরের রাতে হৈ-হৈ চিৎকারে প্রায় সবাই বাঁশঝাড়ের দিকে ছুটল।

গিয়ে দেখে একটা শিংওয়ালা ভূতকে বাঁশের সঙ্গে হাবু দড়ি দিয়ে বাঁধছে আর ডাবুর বাঁ-হাতের কব্জি দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। ডান হাত দিয়ে সে সেটা বন্ধ করার চেষ্টা করছে।

লোকজন জড়ো হতেই হাবু বলল, 'এই হচ্ছে আপনাদের বাঁশঝাড়ের ভূত। সঙ্গে একটা পেতনীও ছিল। পালিয়ে গেছে। তবে একটা যখন ধরা পড়েছে, ওটাকেও পাওয়া যাবে।'

ডাবু গিয়ে একটানে মুখ থেকে মুখোশটা খুলে দিল।

সবাই দেখল, বেঁশো ভূত আর কেউ নয়—হটপাড়ার কালু চোর। সবাই একসঙ্গে পাইকারী হারে এমন কিল-চড়-ঘুষি মারতে লাগল যে কালুচোরের পটল তোলার অবস্থা হওয়ার মতো। আর সনাতনের রাগটা যেন সবার চেয়ে অনেক বেশী। এই ভূতবেশী চোরের জন্যই তাকে অনেক গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে। সে একই সঙ্গে হাত এবং মুখ চালাতে লাগল, 'বেটা চোর। চুরি করার নতুন ফন্দি বের করেছ। ভূত সেজেছ! তোমার ভূত আমি ছাড়িয়ে দিচ্ছি।'

হাবু এগিয়ে গিয়ে বলল, 'দেখুন, এরপর আর মারধোর করলে ও সত্যিই পটল তুলবে। সেক্ষেত্রে অন্যজন কে ছিল, সেটা আর জানা যাবে না। অথচ সেটা জানা দরকার। তার থেকে পুলিসকে খবর দিন।'

পুলিসের নাম শুনে কালু কেঁপে উঠল।

তোতলা রতন বলল, 'ব্যা-ব্যা-ব্যা-ব্যা-ব্যাটাকে পু-পু-পু-পু-পু-পুলিসেই দা-দা-দা-দা-দা-দাও!'

সমর বাধা দিয়ে বলল, 'না, ওকে গাঁয়ে নিয়ে চল। আগে হাতের সুখ করে আচ্ছা করে পেটাব, তার পর পুলিসে দেব।'

সবাই সমরের কথায় সায় দিল। কোমরে দড়ি বাঁধা কালুচোরকে গাঁয়ের দিকে টানতে টানতে নিয়ে গেল।

পলক এসে হাবু-ডাবুকে ধরল।

দশ

'কি করে বুঝলে বল তো যে বাঁশঝাড়ের ওগুলো আসলে ভূত নয়—মানুষ?'

হাবু উত্তর দিল, 'মানুষ না হলে বাজার, টাকা, চকলেট আর কে নেবে?'

'তা হলে পারব না বলে তোমরা পালালে কেন?'

'পালাইনি তো!' ডাবু বলল, 'আমরা শুধু পালানোর ভান করেছিলাম, যাতে চোররা জানে যে আমরা চলে গেছি। না হলে কি এত তাড়াতাড়ি ধরা পড়ত?'

'তা সত্যি, কিন্তু আজ কি করে ধরলে বল তো?'

'হ্যাঁ, ধরাটা একটু মুশকিল ছিল!' হাবু জানাল, 'কারণ কালুরা দুজন ছিল। কিন্তু ওবা একজনের বেশী লোক থাকলে ধরছিল না। একজনের দুজনের সঙ্গে মারামারি করা যায়, কিন্তু দুজনের একজনকে আটকে রাখা যায না।'

'তা হলে আজ কি করে রাখলে?'

'আমরাও দুজন ছিলাম!'

'তোমরা যে বললে একা না থাকলে ধরে না?'

'হ্যাঁ।' ডাবু উত্তর দিল, 'সামনে আমি একাই ছিলাম, দেখতে না পায় এরকম দূরত্বে হাবু অপেক্ষা করছিল।'

'ওকে খবর দিলে কি করে?'

'কেন? আমাদের কাছে যে ছোট ছোট ওয়ারলেস সেট আছে, তা জান না? যেই ভূতে ধরেছে, আমিও ভূত বলে ভূতকে জড়িয়ে ধরেছি। ধরা পড়ে গেছে বুঝে পালাবার জন্য ভূতটা আমার হাতে ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। অন্য ভূতটাও ছুটে আসছিল, কিন্তু ততক্ষণে সাইকেল চড়ে হাবুও পৌঁছে গেছে। হাবু এসে হাত মটকে ছুরিটা কেড়ে নিয়েছে। অন্য ভূতটা বেগতিক দেখে বেপাত্তা হয়ে গেছে।'

এগার

'সত্যি, কি বুদ্ধি তোমাদের! আমাকে তোমাদের দলে নেবে?'

'নেব। না হলে তোমাকে এরকম একটা দল করে দেব। কিন্তু তার জন্য আমাদেব বেঁচে থাকতে হবে। এরকম রক্ত ঝরতে থাকলে বেশীক্ষণ বাঁচব না।'

পলকের খেয়াল হল, সত্যি তো, ডাবুর হাত দিযে এখনও রক্ত পড়ছে। সে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য তার হাত ধরল।

শনিবার সন্ধ্যায় সীমা ফোন করে। বিজয় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। রাত নটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও যখন কোন ফোন এল না তখন বুঝল সীমা আজও ল্যাবে গেছে। একবার ফোন করে দেখলে হয়, কিন্তু ল্যাবে পেতে অনেক দেরী হয়। তার থেকে কাল সকালেই করবে। ববং এখন সে একটা চিঠি লিখবে। কাগজ-কলম নিয়ে বসল। কিন্তু ভাল লাগল না। আখুর ব্যাপারটা জানার পর থেকে মনটা কেমন বিষিয়ে গেছে। আর লিখেই বা কি হবে? গত মাসে সে অন্তত দশখানা চিঠি পাঠিয়েছে। সীমার কাছ থেকে একখানারও উত্তর পায়নি। আগের সপ্তাহে দিনতিনেকের জন্য সে বাঙ্গালোরে একটা সেমিনারে গিয়েছিল। যাবার আগে সীমার চিঠির জন্য পোস্টঅফিস পর্যন্ত গিয়েছিল। সপ্তাহ দুয়েক কোন চিঠি আসেনি। নিশ্চয় পোস্ট অফিসে পড়ে আছে। পোস্টমাস্টার খোঁজ নিয়ে বলেছিল, 'না বিজয়বাবু, বাইরে থেকে আপনার কোন চিঠি আসেনি।' মনে হয়েছিল, ডাকে কোন গণ্ডগোল হচ্ছে। বাঙ্গালোর থেকে ফিরে আশা করেছিল একসঙ্গে সীমার পাঁচ-সাতখানা চিঠি পাবে। একটিও না পেয়ে ফোন করেছিল। সীমা বলেছিল, 'না, ব্যস্ততার জন্য একদম লিখতে পারিনি।'

'কিরকম ব্যস্ততা?'

'সকাল সাড়ে সাতটা-আটটার মধ্যে ল্যাবে যাই। ফিরি সেই আটটায়।'

'তোমাকে বলেছি না, ফিরতে রাত করবে না?'

'রাত কোথায়? এখানে সাড়ে আটটার সময় সন্ধ্যা হয়।'

'তা হলে ঠিক আছে। বন্ধু-বান্ধব জুটল?'

'আখুর কথা তো তোমাকে বলেছি।'

'হ্যাঁ, একদিন তোমাকে বাজারে নিয়ে গিয়েছিল। আর একদিন বাড়ীতে গল্প করতে এসেছিল।'

'ও উনিশ তারিখে দেশে ফিরে গেছে।'

'যাবার সময় তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'দেখা হয়েছে মানে? ওর ক্যামেরা, টিভি সব আমাকে দিতে এসেছে, আমি না নেওয়ায় খুব দুঃখ পেয়েছে। তারপর দেখি, একটা সোনার ব্রেসলেট বের করল। ওটাও আমি নেব না বলেছিলাম। তাতে কি করল জান? জাপানী কায়দায় হাঁটু গেড়ে আমার সামনে বসে পড়ল। হাত জোড় করে প্রার্থনা করতে লাগল। আমি আর না করতে পারিনি।'

'আচ্ছা। কিন্তু তুমি তাকে কি দিলে?'

'যখন আমাকে ও ব্রেসলেট দিল, তখন আমি ওর স্ত্রীর জন্য একটি সোনার আংটি কিনে দিলাম।'

বিজয়ের বুকের মধ্যে বেজায় জ্বালা করছিল। সেটাকে বুকে চেপেই সে কথা চালিয়ে গেল, 'ও বিবাহিত?'

'হ্যাঁ, তিনটে ছেলেমেয়েও আছে।'

'তারপর?'

'রোজ সকাল বিকেল জাপান থেকে ফোন করছে। আমাক বারবার জাপানে বেড়াতে যেতে বলছে। বলছে, কবে যেতে চাই জানালে প্রথম বারের টিকিটটা ওই-ই পাঠাবে।'

'আমার জন্যও পাঠাবে, না শুধু তোমার জন্যে?'

'তোমাকে চেনে?'

'তাও তো বটে। আর?'

'আর বলছে, আমি চাইলে ওদের কোম্পানীতে আমাকে একটা ভাল চাকরি করে দেবে।'

'একদম পাকা ব্যবস্থা! কবে যাচ্ছ?'

'ওরকম করে বলছ?'

'না না, ঠাট্টা করছিলাম। তবে ও মনে হচ্ছে তোমাকে ভালবেসে ফেলেছে।'

'হ্যাঁ, দেশে ফিরে খুব মন খারাপ হয়ে গেছে।'

'আর তোমার? তোমারও তো দেখছি—।'

'তোমার কোন ভয় নেই।'

'না থাকলেই ভাল। ছাড়ি তা হলে?'

'তোমার ক্লাসের দেরী হয়ে যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ, দশটা বেজে গেছে। ফার্স্ট পিরিয়ডেই ক্লাস আছে।'

'আচ্ছা।' সীমা ফোন ছেড়ে দিল।

বিজয়ের মনে হল, এখন সীমার মনের অনেকটাই জুড়ে আছে আখু। তাই বিজয়ের অভাব সে ততটা অনুভব করছে না। তাই চিঠিও আসছে না, ফোনও না। আলোটা নিভিয়ে সে শুয়ে পড়ল। কিন্তু অনেকক্ষণ ঘুম এল না। বারবার সেই দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল : সীমা দেবীব মত দাঁড়িয়ে আছে। আখু তার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে প্রসাদ ভিক্ষা করেছে! সীমা তাকে হাত ধরে তুলছে। পাশাপাশি সীমার আমেরিকা রওনা হওয়ার ক্ষণটির কথা মনে পড়তে লাগল. বিজয়ের বুকে মুখ গুঁজে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ছোটবেলায় মাব কাছে শোনা কথাটা যেন খুবই সত্যি : বিটি আর মাটি যখন যার কাছে থাকে তার! সে ঘুমোনোর চেষ্টা কবল।

এক সময় হঠাৎ তার মনে হল, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে তাকে দিল্লী যেতে হবে। সীমা এসে অনুযোগের ভঙ্গীতে বুকে মুখ গুঁজল। বিজয় বাঁ হাত দিয়ে তাকে বেষ্টন কবে ধরল। সে মনখারাপ করে বলতে লাগল, 'তোমাকে যেতে হবে না। একা একা আমাব একদম ভাল লাগে না।' বিজয় সীমাকে বোঝাতে যাচ্ছিল, হঠাৎ করে ঘুমটা ভেঙে গেল। বিজয় দেখল, সে বিছানায় শুয়ে আছে। বুকটা খালি। আবেগে দম আটকে আসতে লাগল। কষ্টটা বুকে নিয়েও সে চোখ বন্ধ করল, যদি সীমা স্বপ্নে আর একটিবার আসে! কিন্তু ঘুমই এল না তো সীমা আসবে কি? কলিং বেলটা বিশ্রীভাবে বেজে উঠল। দরজা খুলে দেখল, ধোপা দাঁড়িয়ে আছে। ধোপাকে

কাপড় দিয়ে দরজা বন্ধ করল। তারপর কি কববে ভেবে পেল না। ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখল, সওয়া ছটা বাজছে। এখন ওখানে বাত পৌনে নটা-টটা হবে। সীমা নিশ্চয় বাড়ী ফিরেছে। সে ফোনটা তুলে ডায়াল করতে লাগল। সীমার কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'সীমা স্পিকিং।'

'বিজয় বলছি। কখন ফিরলে?'

'না, আজ রবিবারে ল্যাবে যাইনি। গত একমাস ধবে ১২/১৩ ঘণ্টা খাটছি। শরীরে আর কুলোচ্ছিল না, আজ বিশ্রাম নিয়েছি।'

'ঠিকই করেছ। শরীরটাব প্রতি আর একটু নজর দিও। তোমার কাজ এগুচ্ছে?'

'হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত ঠিকই আছে। পবে কি বেরুবে কি জানি!'

'আখুব খবব কি?'

'আজ সকালে ফোন কবেছিল।'

'কি বলে?'

'ওব খুব মন খারাপ করছে। আমি যেন একবাব অবশ্যই যাই।'

'দেখ, ও চলে আসবে!'

'না, ওখানে খুব কড়াকড়ি। না হলে হয়ত চলে আসত।'

'আব কোন বন্ধু যোগাড় হল?'

'বন্ধু তো যোগাড় করতে পাবি, কিন্তু ভয় কবে।'

'কেন? ওখানকার বন্ধুরা কি জোব করে কিছু করতে চায় নাকি?'

'জোব কবে নয়, তবে খুব তাড়াতাড়ি অ্যাপ্রোচ কবে।'

'তুমি কি করে বুঝলে?'

'দেখছি তো। যেন যা কবতে চাও তাড়াতাড়ি করে ফেল! দেবী করা কেন? একদম তর সয় না! তাব ভাবালুতার ভ-মাত্র নাই—তুমি তো জান, একটু ভাবালুতা না থাকলে আমার সঙ্গে হয় না।'

'জানি। আখুর ভাবালুতা ছিল?'

'ভাবালুতা ছিল, তাছাড়া ওবা মেয়েদেব যথেষ্ট সম্মান করে। ওকে নিয়ে কোন ভয় ছিল না।'

'তা হলে তো ও চলে গিয়ে তোমার ক্ষতিই হল। কাল রবিবার কি কবছ?'

'কাল ল্যাবের ছেলেমেয়েরা সব পাশের মাঠে পিকনিক করতে যাবে। আমাকেও ধবেছে। বোধ হয় যেতে হবে।'

'তা যাও। তবে ওখানে তো ড্রাগের ছড়াছড়ি, না জেনে ড্রাগ নিও না যেন।'

'ড্রাগ নয়, তবে আমাদের ল্যাবে একজন ফ্রেঞ্চম্যান আছে। ও বলেছে, আমাকে মদ খেতে হবে।'

'খাচ্ছ?'

'না না। তবে আমি মদ খাইনে বলে খুব হাসাহাসি কবে।'

'মূর্খ! জানে না যে মদ খাওযা থেকে না খাওয়াই ভাল সেইজন্য!'

'তুমি রেগে যাচ্ছ কেন?'

'না না, আসলে কিছুক্ষণ আগে তোমাকে স্বপ্নে দেখছিলাম তো, তাই মনটা

কিরকম হয়ে আছে। একা একা থাকা খুব কষ্টের।'

'আমার কিন্তু অত বেশী কষ্ট হচ্ছে না। তোমার জন্যে মন খারাপ করছে ঠিকই, কিন্তু যখন দেখছি, আমি সবকিছু করতে পারছি, আমার যা খুশী করতে পাচ্ছি—তখন ভালই লাগছে।'

'ভাল। এরকমভাবে পারলে ওখানে থাকাটা তোমার কাছে অতটা কষ্টকর হবে না। আজ রাখছি।'

'মাঝে মাঝে ফোন কোরো।'

'করব।' বিজয় ফোন নামিয়ে রাখল।

সীমার সঙ্গে কথা বলে তার কোন লাভ হল না। বুকের ভারটা বরং বেড়েই গেল। মনে হল, সীমা বেশ মজায় আছে। সে অযথা তার জন্যে চিন্তা করছে। অথবা মজায় আছে বলেই কি তার খারাপ লাগছে? সে কি আশা করেছিল যে তাকে ছেড়ে থাকতে সীমার খুব কষ্ট হবে? বিরহ-যন্ত্রণায় ঘরের কোণে চুপ করে বসে থাকবে? সীমার প্রসঙ্গ ভোলার জন্য সে অন্য কথা ভাবতে লাগল। মনে পড়ল, নন্দিতা আজ সকাল সকাল একবার ল্যাবে যেতে বলেছিল। ওর নাকি কি কথা আছে। নন্দিতার মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। সুন্দর মেয়েটি—শান্ত, সৌম্য, কাজে যত্নশীলা, অথচ সপ্রতিভ। বিজয় অনেকদিন থেকে তার প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করে। ঐভাবে বিয়েটা না হয়ে গেলে সে আজ নন্দিতাকেও বিয়ে করতে পারত। মনে পড়ল, সে বলে, পরের বউ আর পরের চাকরি নাকি সব সময়ই ভাল হয়। অবশ্য নন্দিতা এখনও কারও বউ হয়নি। তবে শীঘ্রই হবে। বিয়ের নাকি কথা চলছে। নন্দিতা কি সেই কথাই বলতে চায়?

আনমনে বাথরুমে ঢুকে সে দাড়িতে সাবান ঘষছিল, হঠাৎ করে ফোনটা বেজে উঠল। বাইরে এসে রিসিভারটা কানে লাগাতেই সে স্তম্ভিত হয়ে গেল, 'সীমা বলছি।'

'কি ব্যাপার?'

'মনটা আনচান করে উঠল, তাই ফোন করলাম।'

'আনচান কেন?'

'ফোনে তোমার গলাটা খুব কষ্ট-কষ্ট মনে হল! তোমার কি খুব মনখারাপ করছে?'

'না না, এই তো পড়ছিলাম। কিছুক্ষণ আগে তোমাকে স্বপ্নে দেখেছিলাম। তুমি তো জান, স্বপ্ন দেখলে কিরকম একটা হয়! সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে ফোন করা ঠিক হয়নি।'

'না, তা বলছি না। আসলে তুমি ভাল নেই জানতে আমার খুব কষ্ট হয়, আমি থাকতে পারিনে।'

'তুমি একদম ভেবো না। আমি খুব ভাল আছি। মন খারাপ কোরো না।'

'তা হলে মাঝে মাঝে ফোন কোরো। আমার ভাতে সিটি দিচ্ছে, এখন ছেড়ে দিচ্ছি।'

বিজয়ের মনটা আবার অশান্ত হয়ে উঠল। সেটাকে শান্ত করার জন্য দাড়ি কামানো বাদ দিয়ে সে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। মনে হল, একবার কোথাও থেকে

ঘুরে এলে হয়। কিন্তু কোথায় যাবে? একা একা বেড়াতে যেতে ভাল লাগে না। শ্বশুর-শাশুড়িরা যা করেছে, তারপর ও-মুখো হওয়াই তাব অনুচিত মনে হয়। এক আছে নিজের গ্রাম। কিন্তু সেখানে গিয়েও সে শান্তি পায না। গ্রামের সবাই তাকে ভালবাসে, সম্মানও করে, কিন্তু কেউ সমব্যথী হতে পারে না। লেখাপড়া শিখে সাধারণ মানুষের থেকে এত দূরে সবে এসেছে যে, তার অনুভব-অনুভূতিব ধারে কাছে তারা আসতে পারে না। তাব থেকে তার ল্যাবই ভাল। দাড়ি কামিযে সে জামা-কাপড পরতে লাগল। আবাব কলিং বেলটা বেজে উঠল।

দরজা খুলতে নন্দিতা বলল, 'ল্যাবে গিয়ে দেখলাম আপনি যাননি, তাই বাড়ীতেই চলে এলাম।'

'আমি এই বেরুচ্ছিলাম। তবে চলে যখন এসেছ এখানেই বস।'

নন্দিতা গিয়ে একটা চেযাব টেনে নিযে বসল। দরজাটা বন্ধ কবে বিজয রান্নাঘরে ঢুকল। ফ্রিজ থেকে দুটো মিষ্টি এবং ফিল্টার থেকে এক গ্লাস জল এনে টিপয়ের ওপর রাখল। তারপর একটা চেযার টেনে নিয়ে নন্দিতার মুখোমুখি বসল। এক পলক মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'কি বলবে বলছিলে বল।'

'বলছি বিজয়দা। এক্ষুনি তো এলাম, একটু বসতে দিন। আপনি কি যত তাড়াতাড়ি পারেন, আপনার বাড়ী থেকে আমাকে তাড়াতে চাইছেন?'

'না না! তোমাকে তাড়াতে চাইব কেন? এসেছ, যতক্ষণ খুশী থাক—সারাদিন থাক। কি বলবে বলছিলে তাই জিজ্ঞেস করছি। থিসিস তো জমা দিলে, এরপরে কি করবে?'

'না বিজয়দা, সে সিদ্ধান্ত আমি নিয়ে নিয়েছি। কলেজ সার্ভিস কমিশনে ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম। কলকাতারই একটা কলেজে পেয়েছি। জয়েন করব। তাবপব ইউনিভার্সিটিতে আসার চেষ্টা করব।'

'তাহলে?'

'আজ আমি আপনার কথা জানতে এসেছি।'

একথা শুনে বিজয় প্রথমটা থতমত খেল। তারপর মুখ তুলে নন্দিতাব চোখের দিকে তাকাল। নন্দিতা বলল, 'আমার বুঝতে যদি ভুল না হয়, তবে আপনি আমাকে খুব পছন্দ করেন!'

'তোমার বুঝতে ভুল হয়নি।'

'তাই আশা করছি, আপনি আমাকে মিথ্যা কথা বলবেন না।'

'বলব না, বল তুমি কি জানতে চাও?'

'আপনি পড়াশোনায় রেজাল্ট খারাপ করেননি, গবেষণার কাজও খারাপ করেননি। 'নেচার'-এর মত জার্নালে আপনার পেপার পাবলিশ হয়েছে। এই বয়সেই ইউনিভার্সিটির লেকচারার হয়েছেন। এরপরেও আপনি এতটা বিষণ্ন কেন? কারও সঙ্গে কথা বলেন না, সব সময় গুম মেরে থাকেন। আপনার দুঃখটা কোথায়?'

'তুমি ভুল করছ, সব মানুষের প্রকৃতি তো একরকম হয় না। সবাই কি হৈ-হুল্লোড় করতে পারে?'

'এড়িয়ে যেতে চাইলে আপনি অনায়াসেই এড়িয়ে যেতে পারেন। সেক্ষেত্রে

আমি জোরও করব না। তবে আমি আশা করেছিলাম যে, আমাকে আপনি সব কথা বলবেন। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আপনি বলতে পারেন যে, আপনার কোন দুঃখ নেই?' নন্দিতা সোজা বিজয়ের চোখে চোখ রাখল। বিজয় চোখ নামিয়ে নিয়ে উত্তর দিল, 'যা আছে তা বলার মত কিছু নয়। আর বললেও লোকে ভুল বুঝবে।'

'আপনি কজনকে বলেছেন?'

'কাউকে নয়।'

'তা হলে কি করে বুঝলেন যে ভুল বুঝবে? আমাকেই বলে দেখুন, ভুল বুঝি কিনা!' নন্দিতা তার মুখের দিকে চেয়ে থাকল। বিজয় বিধ্বস্তের মত খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল, তারপর কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে লাগল, 'দেখ, আমি জন্মেছিলাম অজ পাড়াগাঁয়ের এক গরীব ঘরে। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল অত্যন্ত তীব্র। সে আকাঙ্ক্ষার অনেকখানি জুড়ে ছিল মনের মত একজন সুন্দরী স্ত্রী লাভ। আমার কি করে একটা ভুল ধারণা হয়েছিল যে, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলেই তা সম্ভব। তাই পড়াশোনাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলাম। তাছাড়া হাইস্কুল থেকে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত আমার পড়ার খরচা আমাকে নিজেকেই যোগাড় করতে হত। ক্লাসের পর টিউশনি করে নিজের পড়া করারই সময় হত না, তাই অন্য কিছু ভাবার সময় ছিল না। পি-এইচ. ডি.-তে ঢুকে যখন মাসে মাসে স্কলারশিপ পেতে লাগলাম তখন একটু অবসর হল।

'সায়েন্স কলেজে আমাদের ল্যাবে মধুমিতা বলে একটি মেয়ে কাজ করত। ওকে আমার ভাল লাগত। ও আমার দুর্বলতার কথা বুঝতে পেরেছিল। তাই টেস্ট টিউব ধোওয়া, সলিউশান তৈরী করা থেকে আরম্ভ করে পেপার লেখার কাজে পর্যন্ত আমাকে ভূতের মত খাটিয়ে নিয়েছিল। তারপরও থিসিস সাবমিট করে এসে বলেছিল, 'স্টেটসে বেড়াতে যাব, টাকায় হচ্ছে না, কিছু টাকা যোগাড় করে দে তো!'

'কিন্তু তোদের তো যা শুনেছি অবস্থা খুব ভাল!'

'ভাল, কিন্তু বেড়াতে যাওয়ার জন্য বাবা টাকা দেবে না। তবে একবার চলে গেলে নিশ্চয় দিয়ে দেবে।'

স্কলারশিপের টাকা থেকে জমানো পুরো দশ হাজার টাকা তুলে এনে দিলাম। মধুমিতা স্টেটসে গিয়ে তার মনের মানুষের সঙ্গে মিলিত হল। মধুমিতার বাবার অভিযোগ পেয়ে পুলিস এসে ধরল আমাকে। কয়েকদিন হাজতে থাকতে হল! তারপব ল্যাবের কাজটা নিয়েই টানাটানি! ভবেশবাবুর হস্তক্ষেপে কোনরকমে রক্ষা পেলাম। বলতে গেলে ওনারই চেষ্টায় লেকচারার হলাম।

'মধুমিতার ব্যাপারটা আমাকে আঘাত দিয়েছিল, কিন্তু শিক্ষা দিতে পারেনি। তাই সীমার ক্ষেত্রে একই ভুল করলাম। বর্ধমানে একটা সেমিনারে গিয়ে সীমার সঙ্গে আলাপ। তারপর ওরা আমার বাড়ীতে এসেছে। আমিও গেছি। একদিন সীমা একাকী চলে এল। রাতেও থাকল। আমি ওকে বাড়ীতে পৌঁছে দিতে গিয়ে এক আশ্চর্য পরিস্থিতির সম্মুখীন হলাম। সীমার বাবা বলল, 'পাঁচজনে পাঁচ কথা বলছে, বিয়ে করে নাও।' সীমা কান্নাকাটি করতে লাগল। আমি সীমাকে বিয়ে করতে রাজী ছিলাম, তবে সবকিছু গুছিয়ে নেওয়ার জন্য মাসতিনেক সময় চেয়েছিলাম। কিন্তু ওরা সে

সময় আমাকে দেয়নি। সীমার বাবা বলেছিল, যদি তিন মাস পরে বিয়ে করবে, তা হলে এখন মেলামেশা করলে কেন? আমি আবারও মর্মাহত হয়েছিলাম। রাগে-দুঃখে বলেছিলাম, ব্যবস্থা করুন, আমি এক্ষুনি বিয়ে করব। আমার অভিমানের কোন মূল্য তারা দেয়নি। রেজিস্ট্রারকে ঘুষ দিয়ে ব্যাক ডেটে নোটিশ করা দেখিয়ে সেদিনই বিয়ে রেজিস্ট্রি করে দিয়েছিল। তাই বিয়ের রাত থেকেই সীমা এবং শ্বশুর-শাশুড়ি সম্পর্কে আমার মন বিরূপতায় ভরে গিয়েছিল। তবুও সীমাকে আমি স্বীকার করে নিয়েছিলাম এবং স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু স্বাভাবিক সম্পর্ক কপালে নেই। একদিন আমার ল্যাবের টেবিলে একটা প্যাকেটে ভরা কতকগুলি চিঠি পেলাম। তার মামাতো দাদাকে লেখা সীমার চিঠি। পড়ে বুঝলাম, শুধু মানসিক নয়, তার সঙ্গে সীমার শারীরিক সম্পর্কও ছিল। সীমাও অস্বীকার করল না, বলল, সব জানলে যদি তুমি আমাকে গ্রহণ করতে না চাও তাই বলিনি।

'আমার মনে হয়েছিল, আমাকে পরিকল্পনা মাফিক ঠকানো হয়েছে। আমি এটা সহ্য করতে পারিনি, জীবনে এই প্রথম আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল। ইনজেকশান দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হয়েছিল। আমার এই অবস্থায় দেখে সীমাও পাগল-প্রায় হয়ে গিয়েছিল। শ্বশুর ভালমানুষ সেজে বলেছিল, আমি জানলে তোমার জীবনটা নষ্ট করতাম না। তুমি আবার বিয়ে কর। আমি মানতে পারিনি। নিজের কাছে তো হেরেই গিয়েছিলাম, বাইরের লোকের কাছে হারতে চাইনি।'

'বাইরের কাছে হারার কথা বলছেন কেন?'

'এই জন্যই তো বলছিলাম, তোমরা ঠিক এটা অনুভব করতে পারবে না! তোমাদের মধ্যে তো আমার মত একটা গেঁয়ো ছেলে লুকিয়ে নেই।'

'ঠিক আছে, আপনি বলুন, তারপর কি হল?'

'তারপর সীমার প্রতি একটা সহানুভূতিও হয়েছিল। আমি ত্যাগ করলে ওর কি হবে? সঙ্গে সঙ্গে তীব্র বিদ্বেষও ছিল। আমি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারতাম না যে, ও বাবা-মায়ের সঙ্গে একযোগে আমাকে ফাঁদে ফেলে আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে করতে বাধ্য করেছে, তাই এক বাড়ীতে বাস করলেও একে অপরের থেকে অনেক দূরে বাস করতাম। কিন্তু একসঙ্গে থাকতে থাকতে একসময় কাছাকাছি এসেছিলাম। তার পুরো কৃতিত্বটাই অবশ্য সীমার। সে মান-অপমান বোধ মনে না রেখে আমার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছিল।

'ইতিমধ্যে ওর এম. এস-সি.-র ফল বের হল। ভবেশবাবু তখনও সায়েন্স কলেজে ছিলেন। ওঁকে ওনার ল্যাবে নিয়ে নিলেন। ও মন দিয়ে কাজ করতে লাগল। কিন্তু কিছুদিন পরে ভবেশবাবু জানালেন যে, ল্যাবের একটি ছেলের সঙ্গে ও একটু বেশী মেলামেশা করছে। একদিন সন্ধ্যার দিকে গেলাম। ভবেশবাবু চলে গেছেন। আর কেউ-ই নেই। সীমা ও ছেলেটি খুব কাছাকাছি বসে হাসাহাসি করছে। আমি ঘরে ঢুকতে দুজনেই চুপ করে গেল। ছেলেটি দূরে সরে বসল। সীমাকে নিয়ে বাড়ীতে এলাম। অভিযোগ করতেই সীমা চটে লাল হয়ে গেল, একসঙ্গে কাজ করি, বসে একটু গল্প করেছি তো কি হয়েছে? ও যদি মেয়ে হত, তা হলে তোমার খারাপ লাগত? লেখাপড়া শিখেছ, বড় হয়েছ, কিন্তু মনটাকে ছোট করে রেখেছ। সবাই

চলে যাওয়ার পর রাতের বেলা নির্জন ল্যাবে একটা মেয়ের সঙ্গে বসে থাকা আর একটা ছেলের সঙ্গে বসে থাকা যে এক নয়, এটা ওকে কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না! উল্টে আমাকে মানতে হল যে, আমার মনটাই সন্দেহপ্রবণ!

'তবে বলায় কাজ হল। সীমা ল্যাব থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে লাগল। মাসখানেক পরে একদিন বাড়ী ফিবে বলল, জান, বাসে একটা ঝামেলা জুটেছে। একটা লোক বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি উঠলেই আমার পাশে এসে বসে। আর একথা-সেকথার ফাঁকে বলে, আমি খুব ভাল।

'লোকটা কে? কোথায় থাকে? কি করে?

'তা জানি নে, মৌলালিব কাছে নামে। কোন অফিসে নাকি কাজ করে।

'কি করে জোটা ?

'আমি জোটাইনি। পাশে বসে একদিন কোথায় থাকি, কি কবি জিজ্ঞেস করছিল, বলেছি। তারপর কন্ডাক্টর আসতেই জোর করে আমার ভাড়া দিয়ে দিল। ভদ্রতার খাতিরে পরের দিন আমি ওর ভাড়াটা দিয়ে দিয়েছি। আর সেদিন থেকেই ওরকম করছে।

'তা তোমার পাশে যখন বসে, তুমি অন্য কোথাও উঠে গিয়ে বসলেই পার!

'তা হলে ওটাও উঠে গিয়ে পাশে বসবে। আবার জিজ্ঞেস করবে, রাগ করেছি কেন? ঘেন্নায় গা রিরি করে যায়।

'বুঝলাম কি হয়েছে। একদিন সীমার সঙ্গে বাসে গিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে দেখলাম। তারপর মৌলালিতে নেমে ফলো করে গিয়ে দেখলাম, অফিসে নয়—লোকটা একটা পাঁউরুটির মোড়ক ছাপার প্রেসে কাজ করে। প্রেসে কাজ খোঁজার অছিলায় ওর সঙ্গে আলাপ করলাম। পরের দিন বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে আলাপ করলাম, নমস্কার ইন্দ্রজিৎবাবু, আমার নাম বিজয় বিশ্বাস, বাজাবাজার সায়েন্স কলেজে পড়াই।

'কিন্তু কাল যে আপনি প্রেসের কাজ খুঁজতে গিয়েছিলেন?

'আপনি আমার স্ত্রীকে অফিসে কাজ করেন বলেছিলেন তো, তাই আমি অফিসটা দেখতে গিয়েছিলাম!

'আমার ইশারায় সীমা এগিয়ে এল। লোকটা সঙ্কুচিত হয়ে গেল। তারপর ও আর সীমাকে বিরক্ত করেনি।

'কিন্তু সীমা আবার রাত করে বাড়ী ফিরতে লাগল। একদিন বলতে কাজ ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দিল, ওরকম ঘড়ি ধরে ল্যাবের কাজ হয় না। তোমার যদি অতই খারাপ লাগে, কাল থেকে আর ল্যাবে যাব না। পটের বিবি সেজে বসে থাকব! তুমি ঘরে ফিরবে আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে!

কিন্তু তোমার অত রাত হচ্ছে কেন, সেটা তো বলবে।

'সারাদিন কাজ করি। ডাটা কালেক্ট করি। ভবেশদা ফ্রি হবেন, ডাটাগুলো নিয়ে ডিসকাস করব—তারপর তো আসব। না চন্দ্রাণীর মত যেমন খুশী থাকল, ছেড়ে দিয়ে চলে আসব?

'তা নিশ্চয় আসবে না, কিন্তু অত দেরী না হয় সেটাও তো খেয়াল রাখতে হবে।

'আমার দ্বারা হবে না।

'হবে না বললেও সীমা আর সাড়ে আটটা-নটা না করে আটটার মধ্যে ফিরে আসতে লাগল, আর বেড়াতে যাওয়ার বায়না ধরল।

'পুজোর ছুটিতে শিলঙের টিকিট কাটলাম। কিন্তু শিলঙে গিয়ে বেড়াতে বেরুবার নাম করল না। সকালবেলায় গেস্ট হাউসের ছাদে নিয়ে গিয়ে বলল, তোমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছি জান?

'কেন?

'একটা কথা বলব, তুমি রাগ করবে না তো?

'কি বলবে, না জেনে কি করে বলি?

'যাই বলি রাগ করবে না। মনও খারাপ করতে পারবে না।

'আচ্ছা বল।

'সীমা একটুখানি চুপ করে থাকল। তারপর মুখটা নিচু করে অপরাধীর মত বলল, 'ভবেশদার ব্যাপারে আমার মনে দুর্বলতার সৃষ্টি হয়েছে।'

'কিরকম?'

'ভবেশদাকে ভাল লাগে। ওনার সঙ্গে সময় কাটাতে ইচ্ছে করে।'

'ওরকম তো আমাদেরও করে। রাস্তায় হঠাৎ করে একটা সুন্দরী মেয়ে দেখলে আমারও তাকে পেতে ইচ্ছে করে। যুক্তি দিয়ে সে ভাবনাকে দূর করি। তোমার যেটা হয়, সেটাও সেইরকমই একটা অবস্থা।

'তুমি যত হালকাভাবে উড়িয়ে দিচ্ছ, ব্যাপারটা অত হাল্কা নয়।

'আচ্ছা, হালকা যখন নয়, তোমার যা খুশী তাই কোরো, আমার কোন আপত্তি নাই। আমি মন খারাপও করব না।

'সীমা যখন দেখল যে আমি কিছুতেই ওর দুশ্চিন্তাকে পাত্তা দিচ্ছি না, তখন ও যেন নিশ্চিত হল। ঘরে ঢুকে ঘুমোতে লাগল। আমি একা একা শিলং পাহাড়ের পাইন বনের মধ্যে লক্ষ্যহীনের মত ঘুরতে লাগলাম। প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য নিরর্থক মনে হল। লেকের এক নির্জন প্রান্তে বসে মনের ক্ষোভটা ঝেড়ে ফেলার জন্য গুনগুন করে গাইতে লাগলাম, "আমি জেনেশুনে বিষ করেছি পান।" মনে হল, ঠিক হচ্ছে না—যদি গানের কথাগুলো এমন হত, "আমি কিছু না জেনেই বিষ করেছি পান?" যেন সত্যিই বিষ পান করেছি, সীমার সামনে বলেছিলাম বটে, আমি কিছু মনে করব না, কিন্তু তখনই মনটা ব্যথায় টনটন করছিল।

'সেই ব্যথার্ত মন নিয়ে কলকাতায় ফিরলাম। সীমা খুশীমনে ল্যাবে যেতে লাগল আর ভবেশদার সঙ্গে কি কথা হল, ভবেশদা করে হাসতে হাসতে মাথায় হাত দিলেন, করে ঘাড়ে হাত রাখলেন তা বর্ণনা করতে থাকল। আগে হলে হয়ত কিছুই মনে হত না, কিন্তু এখন বর্ণনার প্রতিটি কথা বুকের মধ্যে কেটে কেটে বসতে লাগল।

'মাসছয়েক পর নতুন উপসর্গ জুটল। সীমা একদিন এসে জানাল, আমাদের ল্যাবে মানস বলে একটা নতুন ছেলে এসেছে, আমার খুব ভাল লাগে।

'কেন?

'একদম সাদাসিধে। মনে হয়, যে কেউ ওকে ঠকিয়ে নিতে পারে। ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

'ভালবাস!

'তারপর যদি কিছু করে ফেলি? তুমি দুঃখ পাবে না তো?

'না। তোমার একবার অন্তত কারও সঙ্গে কিছু করা দরকার। তা হলে যদি তুমি উপলব্ধি করতে পার যে, অন্য ছেলেদের মধ্যে আমার থেকে খুব বেশী কিছু একটা নেই! সীমার মতানুসারে, আমি আদর্শবাদী হলেও আমার মধ্যে ভাবালুতার লেশমাত্র নেই। একেবারে খটখটে। তাই ভাবুক একটা ছেলের সঙ্গে মেলামেশার অনুমতি পেয়ে সে খুশীই হল।

'তারপর কখনো দেখতাম, মানস মোটর সাইকেল করে সীমাকে পৌঁছে দিচ্ছে, কখনও শুনতাম দুজনে কফি হাউসে কফি খেতে গেছে, কখনও কাজের পরে একসঙ্গে বসে গল্প করছে। একদিন ল্যাবে যাবার সময় সীমা বলে গেল, আজ আমরা দক্ষিণেশ্বর যাব। দক্ষিণেশ্বরে কি হল জানিনে, রাত দশটা নাগাদ ফিরল। তারপর আর মুখে মানসের নাম শুনি না।

'ততদিনে বাড়ী করার জন্য জমিটা ঠিক হয়ে গেছে। সীমাকে বললাম, আমার টাকায় তো হচ্ছে না। তোমার স্কলারশিপের টাকা থেকে হাজার সাত/আট টাকা দিতে পার?

'তা হলে মানসের কাছে চাইতে হবে!

'মানসের কাছে চাইতে হবে মানে?

'ওর বাড়ীতে কি অসুবিধা হয়েছিল, ধার নিয়েছে, এখনও ফেরত দেয়নি।

'তোমার স্বপনদাকে যে দু হাজার টাকা দিয়েছিলে, তা ফেরত পেয়েছ?

'না, এখনও দেয়নি।

'আমি আর কিছু বললাম না। ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে জমি কিনলাম।

'এই করতে করতে ওর পি-এইচ. ডি. হয়ে গেল। আমাদের দেশে বিদেশের একটা ছাপ না থাকলে স্বীকৃতি পাওয়া মুশকিল। সীমা বাইরে যাওয়ার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল। ভবেশদাই বলে নিউ ইয়র্কের কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে ঠিক করে দিলেন। সব ঠিক হয়ে যেতে ওর প্রচণ্ড মন খারাপ করতে লাগল, তোমাকে ছেড়ে অতদিন থাকতে পারব না। আমি যাব না।

'এরকম সুযোগ তো বারবার আসবে না। শেষে সারাজীবন আসশোস করবে?

'কিন্তু তুমি তো জান, আমি বুঝেসুঝে চলতে পারি নে, ওখানে গিয়ে কি করতে কি করে বসব!

'তোমার যা খুশী হয় কোরো। শুধু একটু সাবধানে থেকো, যেন তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু না হয়।

'কিন্তু সেটাই হতে বসেছিল। ওখানে গিয়ে দেখেশুনে এমন একটা ঘরে গিয়ে উঠল যেটা ভিতর থেকে বন্ধ করা যায় না। একদিন রাত তিনটের সময় সে-বাড়ীর এক ছেলে ঘরে ঢুকল। ভাগ্যি ভাল, তখন ও জেগে ছিল। ও "কে" বলতেই ছেলেটা "সরি" বলে বেরিয়ে গেল। বাড়ীর লোকেরা ওকে বুঝিয়েছে এবং ও সেটাই সত্যি

বলে মেনে নিয়েছে যে, রাতের বেলায় একটা কোর্স করে এসে ছেলেটা ভুল করে ও ঘরে হাতমুখ ধুতে ঢুকে পড়েছিল। আমি সীমাকে কিছুতেই বোঝাতে পারিনি যে ঢোকাটা খারাপ উদ্দেশ্যেও হতে পারে। বোঝাতে পারিনি, যে বাড়ীতে বাড়া আছে সেই বাড়ীর ছেলের অজানা থাকার কথা নয় যে, সীমা ও-ঘরে আছে। তাছাড়া রাতে কোর্স থাকলেও রাত তিনটের সময় কোন ভদ্রস্থ কোর্স শেষ হওয়ার কথা নয়। সীমা শুধু এইটুকু জেনেছে যে, ঘরটা ভিতব থেকে বন্ধ করার ব্যবস্থা থাকা উচিত এবং সে ব্যবস্থা সে করে নিয়েছে।

'এখন অনেকটা সামলেও নিয়েছে। আর ফোন করে "ফিরে আসব, ফিরে আসব" করছে না। কাজটাও পছন্দ হয়েছে। কিন্তু সেই বন্ধু-সমস্যা। বন্ধুদের সঙ্গে নিশ্চয় কোন রিজার্ভেশন না রেখে মিশছে। ফলে খুব সহজেই ওরা ওকে অ্যাপ্রোচ করতে পারছে। আমার দুঃখটা এখানেই।'

বিজয় কথা বন্ধ করে নন্দিতার মুখেব দিকে তাকাল। নন্দিতা যেন স্বপ্নভবা ঘুম থেকে উঠল। মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'সীমাদির ওপর আপনার খুব রাগ হয়, না?'

'রাগ করতে পারলে তো বেঁচেই যেতাম। আর রাগ করতে পারি নে। আমার মনে হয়, ও খুব সহজ সম্পর্ক পছন্দ করে। খুব সহজ ভাবেই লোকেব সঙ্গে মেশে। লোকে সেটাকে ওর প্রশ্রয় ভাবে। গণ্ডগোল হয় সেখানেই। কিন্তু ওর মনে কোন পাপ নেই। ফলে যা ঘটে বা যা মনে হয় সহজেই বলতে পারে। পাপ আছে আমাদের মনে। সেই পাপী মনের দণ্ডে আমরা ওকে পাপী সাব্যস্ত করি। তখন ও খুব চটে যায়। আব কিছুই মানতে চায় না। তাই ওর ওপর রাগ করতে পারি নে। শুধু ওর জন্য কষ্ট হয়।'

বিজয়ের বুকের ভিতর থেকে একট দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। নন্দিতা অনেকক্ষণ কিছু বলতে পারল না। চুপ করে বসে থাকল। তার ঠোঁটদুটো কয়েকবার কেঁপে উঠেও থেমে গেল। বলব কি বলব না, ঠিক করে উঠতে না পারার মাঝেই অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে ফেলল, 'আমাকে তো আপনার ভালই লাগে। ধরুন সবকিছু জানার পরও আপনাকেও আমার ভাল লাগে। নিজেকে আপনার হাতে তুলে দিতে চাই। যদি আপনার ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে হয়, তা হলে?'

'তোমাকে কাছে টেনে নিতে পারলে আমার খুব ভাল লাগত। কিন্তু আমার মধ্যেকার গেঁয়ো ছেলেটা তা করে শান্তি পাবে না। আমার দুঃখটা ঐখানেই। সর্বদাই মনে হয়, আমার যা পাওয়ার কথা ছিল পাইনি। পাওয়ার পথটাও বন্ধ হয়ে গেছে।'

বিছানা বলতে মাটির মেঝের ওপর একটা বস্তা। তার এক প্রান্তে ছেঁড়া কাপড় সেলাই করা শিমুলের তুলোর একটা বালিশ। সেই বিছানায় শুয়ে নয়নের কখনও ব্রততীর মিষ্টি মুখখানা মনে পড়ে, কখনও এক ঝাঁক অদ্ভুত প্রশ্ন তার মাথার দখল নেয়। কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না। পাশের বিছানায় শুয়ে বাবা দিব্যি ঘুমিয়ে যায়। ও-ঘরে শুয়ে মাও ঘুমিয়ে পড়ে।

নয়নের বয়স কত হল, মা ঠিক বলতে পারে না। স্কুলের খাতায় লেখা আছে ষোল, পাড়া-প্রতিবেশীরা বলে, সতের-আঠার। সতের-আঠার বয়স হলে কি এরকম হয়? তা হলে তার দাদা চয়নের কেন হয় না? তার বয়স তো বছর দুয়েক আগেই সতের-আঠার হয়ে গেছে। সেও তো বৌদিকে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে। চয়ন কোনদিন স্কুলে যায়নি, মাঠে বাবাব সঙ্গে কাজ করে। খায়দায়, ঘুমিয়ে পড়ে।

বাবা কদম মণ্ডলের কি খেয়াল হল, মেজ ছেলে নয়নকে পাশের গ্রামের প্রভাত মাস্টারের প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি করে দিল। স্লেট-পেনসিল হাতে দিয়ে বলল, 'তুই আজ থাইক্যা পোড়বি।' নয়নের অদ্ভুত লেগেছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, 'পোড়্যা কি হবে?'

'ঘরবুঝ হবে।'

এই ঘরবুঝ ব্যাপারটা নয়ন অনেকদিন পর্যন্ত বুঝতে পারেনি, এখন বোঝে। ঘরবুঝ মানে জমির খাজনার রসিদ পড়তে পারা। লোককে চিঠি লিখে দিতে পারা। লোকের চিঠি পড়ে দিতে পারা। তা নয়ন এখন ঘরবুঝ হয়ে গেছে। বাবা আর স্কুলে যেতে দিতে চায় না। বলে, 'চাষার ছেলে, অত পোড়্যা কি হবে? চাকরি তো আর পাবি ন্যা!' বাবা কেন যে এরকম বলে, নয়ন বুঝতে পারে না। পড়াও ছাড়তে পারে না। বাড়ির থেকে স্কুলে থাকতেই তার বেশী ভাল লাগে। কেন এমন হয়? মা কোনরকমে ঠেকিয়ে রেখেছে। বাবা একদিন পড়া ছাড়ার কথা পাড়তেই বলেছিল, 'পড়া ছাড়্যা কি এত রাজকাজ করবে শুনি? পোড়ুক না আর কড়া ক্লাস। যদি একটা চাকরি পায়!'

প্রাইমারী স্কুলেই আলাপ হয়েছিল ব্রততীর সঙ্গে। তখন সে ছোট্টটি ছিল। ইনফ্যান্টে পড়ত। তারপর ওয়ান টু করে ফোব। পিয়াশাল প্রাইমারী স্কুল ছেড়ে পলাশতলী হাইস্কুল। সেও অনেকদিন হয়ে গেল। ফাইভ সিকস করতে করতে সে এখন ক্লাস টেনে পড়ে। লিকলিকে লতার মত ব্রততী এখন অনেকটা বড় হয়ে গেছে। যখন সবুজ শাড়ি মসমসিয়ে, রেশমী বেণী দুলিয়ে পাশ দিয়ে হেঁটে যায় তখন বুকের ভিতরটা কেমন করে ওঠে। একান্ত আপন করে পেতে ইচ্ছে করে। চোখ দুটো কি গভীর! নয়ন চোখ বন্ধ করেও দেখতে পায়। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় নতুন ছবি উদিত হয়।

সে পড়তে চায় কেন? সত্যি তো, পড়ে কি হয়? স্কুলের পণ্ডিতমশাই বলেছিলেন, 'পড়াশোনা করা মানে বিদ্যার্জন করা। সরস্বতী বিদ্যার দেবী। বিদ্যার্জন করলে দেবীর কৃপালাভ হয়।' নয়নের ভাল লাগেনি। সে ইতিহাসে পড়েছে, প্রাচীনকালে সরস্বতী

নামে একটা নদী ছিল। সেই নদীকে দেবী বানিয়ে তার কৃপালাভ করাব ব্যাপারে সে কোন আকর্ষণ অনুভব করে না। স্কুলের মৌলভীসাহেবকে জিজ্ঞেস করতে বলেছিলেন, 'ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা অভিভাবকের জন্য ফর্জ অর্থাৎ অবশ্য কর্তব্য। মহম্মদ বলেছেন, বিদ্যাশিক্ষার জন্য দবকার হলে চীনে যাও!' নয়নের মনে হয়েছিল, ভদ্রলোক আর যাই হোক, লেখাপড়া শিখে কি হয় তা বলেননি। আর কাকে জিজ্ঞেস করা যায়? ভাবতে ভাবতে একদিন টিফিনের সময় হেডমাস্টাব মশাইকেই জিজ্ঞেস করে বসেছিল। একটুক্ষণ চুপ কবে থেকে হেডমাস্টাব মশাই কি বলেছিলেন নয়নের মনে নেই, তবে মাসখানেকের মধ্যে তিনি শিক্ষার উদ্দেশ্যেব ওপর একটা সেমিনাবের আয়োজন করেন। সেখানে অনেক ফাঁকা বক্তৃতা হয়, যাব মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যায় না। শুধু একজন লোকের কথা নয়ন খানিকটা বুঝতে পাবে। এমপ্লয়মেন্ট অফিসার বলেন, জীবনে রুজি-রোজগারের জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই কোন না কোন কাজ করতে হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য আমাদের সেই কাজের উপযুক্ত করে তোলা। একজন চাষীর ছেলে খুব সহজেই কখন বীজ বুনতে হয়, কিভাবে নিড়ানি দিতে হয়, কখন ফসল কাটতে হয় তা শিখে যায়। কিন্তু একজন ডাক্তার বা ইঞ্জিনিযাবের ছেলের ক্ষেত্রে তা হয় না, ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে গেলে দীর্ঘ ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের দবকার হয়। কথাটা বোঝা যায়। কিন্তু কেউ যদি এরকম কোন কাজ কবতে না চায় তা হলে কি সে লেখাপড়া করবে না? আবার পট পাল্টায়।

আগামীকাল স্বাধীনতা দিবস। স্কুলের অনুষ্ঠানে ছাত্রদের তরফ থেকে তাকে বক্তৃতা করার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। সাবা সন্ধ্যাটা বসে বসে সে বক্তৃতাব বিষয় বিন্যস্ত করেছে। ব্রততী যেন অনুষ্ঠানে যোগ দেয়, নাহলে অত খাটনি করে বক্তৃতা করে কি লাভ? নয়ন মনে মনে বক্তৃতাটা আর একবার আউড়ে নিতে চেষ্টা কবে। আধো ঘুমে জড়িয়ে যায়। খারাপ লাগতে ঘুম ভেঙে যায়। এরকম কবতে কবতে এক সময় ক্লান্ত হযে ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুমের পথ ধরে স্বপ্ন আসে। স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে ব্রততী। নয়নের মনে হয়, জনকল্যাণ মাঠে প্রকাণ্ড মঞ্চ বাঁধা হয়েছে। ব্রততী সামনের সাবিতে বসে তার বক্তৃতা শুনছে। বক্তৃতা শেষ হতেই এসে বলল, 'খুব সুন্দর বলেছিস।' নযনেব বুকটা আবেগে ভবে উঠছিল। সেই উত্তেজনায় ঘুম ভেঙে গেল। মনটা হুহু করে উঠল। স্বপ্নের ভাল লাগার রেশটুকু তখনও বুকে একটুখানি লেগে আছে। নয়ন চোখ বন্ধ করে সেটা অনুভব করছিল। পাশের বাঁশঝাড় থেকে পাখীর পাখা ঝটপটানির শব্দ ভেসে আসছিল। একটু পরেই তারা ডাকতে শুরু করল। দুয়েকটি ডানায় ভর করে বেরিয়েও এল।

নয়ন চোখ বন্ধ রেখেই বুঝতে পাবল, বাবা বিছানা থেকে উঠে গোয়ালের দিকে গেল। চোখ খুলে দেখল, বাবাকে দেখে গরুগুলো উঠে দাঁড়াল। বাবা তাদের গোয়াল থেকে বের করে, নাঁদে বেঁধে দিয়ে, ভূষির ঘর থেকে শানি বেব করে দিল। গরুগুলো খেতে লাগলে, বাবা পাশের ঝোপ থেকে একটা পিঠুলির ডাল ভেঙে দাঁতন করতে লাগল। নয়নও উঠে পড়ল।

প্রাতঃকৃত্য করার জন্য মাঠের দিকে গেল। আশেপাশে লোক নেই দেখে আস্তে

আস্তে বক্তৃতাটা একবার ঝালিয়ে নিল। বাড়ীতে এসে দেখল, বাবা ত্যালকাটা লাগিয়ে গরুর গাড়ীর চাকায় তেল দিচ্ছে। তেল দেওয়া হয়ে গেলে জোয়ালটা ঠিক করে বাঁধতে লাগল। সে হাতমুখ ধুয়ে স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরী হতে লাগল।

জামাকাপড় পরছিল, বাবা এসে চালের বাতায় বাকি দড়িটা গুঁজে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকাল। নয়ন মুখ তুলতে জিজ্ঞেস করল, 'কুথায় যাবি?'

'স্কুলে।'

'আবুলরা যে বলছিল, আজ ইস্কুল ছুটি!'

'ছুটি মানে, আজ ক্লাস হবে না। পড়াশোনা হবে না। কিন্তু স্কুলে যেতে হবে।'

ছেলের কথা শুনে কদমের কিরকম ধন্দ লেগে যায়। স্কুলে তো লোকে পড়াশোনা করতেই যায়! সেই পড়াশোনাই যখন হবে না তখন স্কুলে যেতে হবে কেন? মনের ভাব গোপন করতে না পেরে জিজ্ঞেসই করে ফেলে, 'কিলাস হবে না তো ইস্কুলে যাইয়্যা কি হবে?'

'স্কুলে অনুষ্ঠান হবে। বক্তৃতা হবে।'

'বক্তিমা হবে তো তোর কি?'

'আমাকে বক্তৃতা করতে হবে।'

'তোখে বক্তিমা কততে হবে?' কদমের আরও গণ্ডগোল হয়ে যায়, 'বক্তিমে তো বাবুরা ভোটের সুমায় করে! তুই কি এবের ভোটে দাঁড়াবি?'

'ভোটে দাঁড়াব কেন?'

'তাহলে?'

'আজ স্বাধীনতা দিবস। তাই স্কুলের মাঠে সভা হবে।'

কদম বুঝতে পারল না। আপন মনে উচ্চারণ করল, 'স্বাধীনতা?'

'হ্যাঁ। আজকের দিনে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি।'

'তুরা? মানে তোর কিলাসের ছেলেরা?'

'শুধু ক্লাসের ছেলেরা হবে কেন?' নয়ন সহজ করে বাবাকে বোঝানোর চেষ্টা করে, 'ছেলে-মেয়ে, নারী-পুরুষ, শহরের লোক, আমাদের মত গ্রামের লোক,—আমরা সবাই!'

'সবাই? মানে তোর মা আর আমিও?'

'হ্যাঁ।'

কদম অবিশ্বাসের চোখে ছেলের মুখের দিকে তাকায়। সত্যিই সেরকম কিছু পেয়েছে কি না মনে করার চেষ্টা করে। মনে করতে না পেরে অসহায়ের মত ছেলেকে জিজ্ঞেস করে, 'হ্যাঁ ব্যাটা, পাইয়েছি যে বলছিস—তা জিনিসট্যা কিরকম? আমার তো একদম মনে পড়ছে না!'

বাবার অকৃত্রিম প্রশ্নের সম্মুখে নয়নও অসহায় বোধ করল। আরও সহজ করে উদাহরণের সাহায্যে বোঝানোর চেষ্টা করল, 'আগে সাহেবরা ছিল না?'

'হ্যাঁ। তোর দাদোর মুখে শুনেছি, নীলকুঠিতে থাকতোক, ঘুড়া ছুটিয়্যা আসতোক।'

'ঐ সাহেবরা আমাদের শাসন করত। আজকের দিনে আমরা ওদের তাড়িয়েছি।'

'কিন্তুক, পলাশতলীতে ড্রামন্ড সাহেবের ব্যাটা ড্রামন্ড সাহেব এখনও আছে!'

'আছে। কিন্তু আমাদের মতই আছে। আমাদের শাসন করছে না। আমাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করছে না। এখন আমাদের খাজনা আমরাই আদায় করি। আগে ওরা আদায় করত।'

খাজনার উদাহরণটা দিতে পেরে নয়নের একটু ভাল লাগল। তার বাবা আর কিছু না হোক, খাজনার ব্যাপারটা বোঝেন। কিন্তু সেখানেও বিপত্তি। বাবা ফ্যালফ্যাল করে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে বসল, 'এখন খাজনা আদায় করে হিমান মহুরি, আগে আদায় করত উয়ার বাপ ধীমান মহুরি। ধীমান কি তা হলে সাহেব ছিল?'

নয়ন বুঝল, বাবাকে স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য বোঝানোর সাধ্য তার নেই। ব্যাপারটা বোঝার জন্য ন্যূনতম যে ধ্যান-ধারণা বা শিক্ষা থাকা দরকার, তা তার বাবার নেই। তার বাবা অশিক্ষিত।

সঙ্গে সঙ্গে খটকা লাগল। লাল পার্টির রহমান মাস্টারের কথা মনে পড়ল। রহমান মাস্টার বলেন, 'আমাদের দেশের শ্রমিক-কৃষকদের অশিক্ষিত বললে সম্রাট আকবরকেও অশিক্ষিত বলতে হয়। কারণ তাঁরও অক্ষরজ্ঞান ছিল না। কিন্তু তিনি যেমন উত্তমরূপে রাজনীতি শিক্ষা করেছিলেন, শ্রমিক-কৃষকরাও নিজেদের বৃত্তিটা শিক্ষা করে—তাই তাদের নিরক্ষর বলা যায়, অশিক্ষিত নয়।'

তা না হলেও বাবাকে বোঝাতে অনেক সময় লাগবে। এখন বোঝাতে গেলে স্কুলের স্বাধীনতা দিবসের সভায় আর বক্তৃতা করা হবে না। তাড়াতাড়ি জামার বোতাম লাগাতে লাগাতে বলল, 'স্কুল থেকে এসে বলব।' চটিটা পরে নিয়ে চলতে লাগল।

অল্প সময়েই সে গ্রামের সীমানা পেরিয়ে পিয়াশালের নদীর ধারের রাস্তায় এসে পড়ল। কিন্তু প্রত্যাশামত ব্রততীকে রাস্তার কোথাও দেখতে পেল না। তা হলে কি কোন কারণে ও না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল? না আগে চলে গেল? নয়ন আরও জোরে হাঁটতে লাগল।

স্কুলে পৌঁছে দেখল, অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। হেডমাস্টার মশাই পতাকা তুলছেন। এন সি সি-র ছেলেরা পোষাক পরে, বন্দুক ধরে, লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে সন্তোষবাবু তলোয়ার হাতে করে দাঁড়িয়ে আছেন। উনি 'সালামী শাস্ত' বলে তলোয়ারটা ঘুরিয়ে নাকের কাছে তুলে আবার চট করে নীচে নামিয়ে দিলেন। তার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরাও বন্দুকগুলো ঝনাৎ করে সামনে তুলে দিল। সবাই মিলে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে লাগল, জন-গণ-মন অধিনায়ক জয় হে...। নয়নও গিয়ে টুক করে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ল। জাতীয় সঙ্গীত শেষ হতে সন্তোষবাবু তলোয়ার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আরও কি কি বললেন। এন সি সি-র ছেলেরা বন্দুক পাশে নিয়ে বসে পড়ল। অন্য ছেলেমেয়েরাও যে যার জায়গায় বসতে লাগল। নয়নকে দেখে রহমান মাস্টার এগিয়ে এলেন, 'কিরে? তোর আসতে এত দেরী হল? বলবি তো?'

নয়ন ঘাড় নেড়ে শুধু শেষ প্রশ্নটার উত্তর দিল, 'হ্যাঁ।'

'এই উদ্বোধনী সঙ্গীতটার পর একটা আবৃত্তি আছে, তারপর তোর নাম ডাকা হবে। রেডি থাক। ঠিক আছে?'

নয়ন আবারও ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল, 'ঠিক আছে স্যার।' যাতে ভালভাবে

শুরু করতে পারে তার জন্য বক্তব্যের প্রথম অংশটার শব্দগুলো গুছিয়ে নিতে লাগল। নাম ডাকা হলে স্টেজের ওপর উঠে মাইকের সামনে দাঁড়াল। বুকটা তখন ধুকধুক করছিল। 'মাননীয় সভাপতি মহাশয়!' বলতে গিয়ে গলাটা একটু কেঁপে গেল। 'শ্রদ্ধেয়' কথাটা ঠিক উচ্চারিত হল না। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ধাতস্থ হয়ে গেল। তার বক্তব্য গুছিয়ে বলতে লাগল।

'...আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে আজকের দিনটিতে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। ছিদ্রান্বেষীরা মুখ বাঁকা করে বলতেই পারেন, এ স্বাধীনতা অর্থহীন! কারণ এ স্বাধীনতা আমরা সংগ্রাম করে নিঃশর্তভাবে অর্জন করতে পারিনি। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এক আইন পাশ করে আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছে। আমাদের দেশ এখনও কমনওয়েলথ-ভুক্ত, যার মাথায় বসে আছে ব্রিটেনের রানী। আমি বলব, তা হলেও আমাদের দেশটা কিভাবে চলবে সেটা আজ আমরাই ঠিক করি। একথা ঠিক যে, স্বাধীনতার সুফল আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায়নি। সকলে এ ব্যাপারে সচেতনও নয়। তাদেরকে সচেতন করতে হবে। এমন ব্যবস্থা করতে হবে যে, স্বাধীনতার সুফল সকল দেশবাসীর কাছে পৌঁছায়।

'বেদনার দিক আরও আছে। আজকের দিনটিতেই সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দেশটাকে ভেঙে দু' টুকরো করা হয়েছিল, যা আজ তিন টুকরোতে পরিণত হয়েছে।...'

নয়নের মনে হল, ছাত্র শিক্ষক এবং অন্যান্যরা উপস্থিত সবাই তার বক্তৃতা খুব মন দিয়ে শুনছে। সবাই তার বক্তব্য বুঝতে পারছে। এখানকার সবাইকে সে বোঝাতে পারে, কিন্তু নিজের বাবাকেই বোঝাতে পারে না! এ কেমন লেখাপড়া সে শিখেছে? নিশ্চয় সে খুব ভালো জানে না, তাই সহজভাবে তার বাবার বোধগম্য করে বলতে পারে না। এখানে বুঝিয়ে কি লাভ? এখানকার তো সবাই কমবেশী জানে!

নয়ন বক্তৃতা শেষ করে নেমে এল। আরও ঘণ্টাখানেক অনুষ্ঠান চলল। আবৃত্তি-নাচ-গান ছাড়াও রহমান মাস্টার, হেডমাস্টার এবং সেক্রেটারি মহাশয়রা বক্তব্য রাখলেন। সনাতনবাবুর সমাপ্তির সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হল।

গেটের বাইরে আসতে ব্রততীর দেখা মিলল। একদল মেয়ের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছিল। নয়ন দেখল, ব্রততী আজ একটা খুব সুন্দর রানী রঙের শাড়ি পরেছে। উজ্জ্বল রোদকে আড়াল করে মাথায় লাল রঙের ছাতা ধরেছে। ছাতা আর শাড়ির ছটায় সুন্দর মুখখানি আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। নয়নের খুব ইচ্ছে করছিল, একবার কথা বলে। কিন্তু সঙ্কোচ হচ্ছে। ব্রততী ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে কথা বলতে এরকম হয় না। একা থাকলে তাও কথা ছিল। অন্যদের সামনে সে কিছুতেই সাহস পেল না।

নদীর ধারের রাস্তা ছেড়ে মাঠের মধ্যেকার সোজা রাস্তা ধরল। দুপাশে ধানের ক্ষেতে সোনালী ধানের শিষ হাওয়ায় দুলছে। আলের ওপর মহিষ চরছে; রাখাল বালক পিঠের ওপর বসে আছে। একটা ফিঙে এদিক থেকে ওদিক উড়ছে। তারও ওপারে আকাশ যেখানে মাটির সঙ্গে মিশেছে সেদিকে দৃষ্টি রেখে নয়ন আনমনে হাঁটছিল, আর তার বাবার কথা ভাবছিল। তার বাবা স্বাধীনতা কি জানে না! কিন্তু ব্রততীর বাবা জানে। যখন পিয়াশাল স্কুলে পড়ে তখন একবার স্বাধীনতার দিন স্কুলে এসে

বক্তৃতাও দিয়েছিল। হঠাৎ পায়ের শব্দে চমকে উঠল। পাশে তাকিয়ে দেখল, পাশের গ্রামের ষষ্ঠীকাকা পলাশতলী থেকে মাছ বিক্রি করে ফিরছে।

আচ্ছা ষষ্ঠীকাকা কি জানে? নয়নের ভারী জানতে ইচ্ছে করছিল। জানাব জন্য আলাপ শুরু কবল। প্রথমেই তো সরাসবি জিজ্ঞেস কবা যায না, তাই গ্রাম্য সৌজন্যমূলক কুশল জিজ্ঞাসা দিয়ে শুরু কবল, 'কাকা ভাল আছেন?'

'ভাল আছি বাপ। তোমরা ভাল তো? তোমার আব্বা ভাল আছে?'

'ভাল কাকা। বাজারে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ বাপ। মাছ বেচতে গেছিনু।'

'কাকা, স্বাধীনতা দিবস পালন করেন না?'

'আমরা মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, ওসব বুঝি বাবা? ওসব বাজারের বাবুরা করে। আমাদের কাজ না করলে চলে?'

অর্থাৎ ষষ্ঠীকাকাও তার বাবাব মত স্বাধীনতার ব্যাপাবটা বোঝে না। নয়নেব ভাল লাগে না। স্কুলের সভায় হেডমাস্টার আর সেক্রেটারি মহাশয়দের বক্তব্যও তাব ভাল লাগছিল না।

তাঁদের কথা শুনলে মনে হয় না যে, দেশে তাব বাবা বা ষষ্ঠীকাকাদের মত কোন সাধারণ মানুষ আছে। তাঁদেব মত অবস্থাপন্নদেব নিয়ে তাঁরা একটা কাঠামো তৈরী করেছে। সেই কাঠামোর স্বার্থকে দেশের স্বার্থ এবং নিজেদের স্বাধীনতাকে দেশের স্বাধীনতা বলে চালাচ্ছে। সেখানে তার বাবা বা ষষ্ঠীকাকার মত লোকদের কোন ঠাঁই নেই। তাদের অবস্থার তেমন কোন পবিবর্তনও হয়নি। তাই ফারাকটা তারা বুঝতেই পারে না। এদেরকে কি করে বোঝা যায়– বোঝানো যায়?

নিজেকে, নিজের দেশকে, তার পরিপার্শ্বকে জানা কি শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়?

এক

পারুলডাঙ্গা গ্রামের পাশে এসে পাকা রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেই বাঁকের ওপর একটা বড় সাইনবোর্ডে বড় বড় করে রক্তের অক্ষরে লেখা আছে, 'শহীদস্থল'। তার নীচে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট অক্ষরে লেখা আছে, '১৯৩২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারী। এইখানে ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে যান স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিপ্লবী বীর অমর মণ্ডল।' পড়লেই বুকের মধ্যেটা কিরকম তোলপাড় করে ওঠে। মুকুলের একটু বেশীই করে। শহীদ অমর মণ্ডল তাদের গ্রামেরই ছেলে ছিল। বলতে গেলে তার পূর্বপুরুষই। অমর মণ্ডলের দাদা, সমর মণ্ডলের নাতি-নাতনিরা এখনও মুকুলের প্রতিবেশী। তবে তারা অমরের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানে না। মৃত্যুর আগে সে বৃদ্ধ সমরের সঙ্গেও কথা বলেছিল। তিনি শুধু জানিয়েছিলেন, 'অমর আমার চেয়ে তিন-চার বছরের ছোট ছিল। তখন নেত্রহাট হাইস্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ত। বয়স ষোল-সতের হবে। খুব চাপা স্বভাবের ছিল। বাড়ীর লোকজনের সঙ্গেও বেশী কথা বলত না। কি সব বই পড়ত। একদিন হঠাৎ বাড়ীতে পুলিস এসে ওর খোঁজ করল। ঘরের জিনিসপত্র টেনে বাইরে ফেলে দিল। ওকে না পেয়ে আমাকে আর বাবাকে নিয়ে গিয়ে অকথ্য অত্যাচার করল। ক'দিন পর আমাদের ছেড়ে দিল; শুনলাম, ও ধরা পড়েছে। কিছুদিন পর নিয়ে এল। পাকা রাস্তার পাশের বটগাছ থেকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলিয়ে তাজা ভাইটাকে মেরে দিল।' শেষের কথাগুলো বলতে তাঁর গলা কেঁপে যাচ্ছিল, চোখে জল এসে গিয়েছিল। ভাইয়ের প্রতি অকৃত্রিম মমত্ববোধ প্রকাশ পাচ্ছিল। মুকুল অনেক বুঝিয়ে তাঁকে শান্ত করেছিল। কিন্তু অমর সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে আর বেশী কিছু জানতে পারেনি। জেনেছিল নেত্রহাট হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, প্রবীণ স্বাধীনতা-সংগ্রামী বিধুভূষণ দাশগুপ্তের কাছ থেকে।

দুই

বিধুভূষণ অমরদের দু-ক্লাস নীচে পড়তেন। বিয়াল্লিশে মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে ভারত ছাড় আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেলে গিয়েছিলেন। পরে দেশ স্বাধীন হলে নেত্রহাট হাইস্কুলের হেডমাস্টার হয়েছিলেন। এখন তিনি অবসর জীবন যাপন করেন। শুধু কাছাকাছি কোথাও নীল পার্টির সভা-সমিতি হলে নেতারা ধরে নিয়ে গিয়ে সভাপতি করেন। তিনি আপত্তি করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যান। হিংসাশ্রয়ী আন্দোলনকে তিনি কোনদিনই ভাল চোখে দেখতেন না। এখনও দেখেন না। কিন্তু এলাকার অহিংস, সহিংস সব আন্দোলনের খুঁটিনাটি খবর কেবল তাঁর কাছেই পাওয়া যায়।

মুকুল তাঁর কাছ থেকে জেনেছিল যে, তখন নেত্রহাট হাইস্কুলে সুনীল সাহা নামে একজন শিক্ষক ছিলেন। তাঁর সঙ্গে কলকাতার বিপ্লবীদের যোগাযোগ ছিল। তিনি স্থানীয় যুবকদের নিয়ে একটা গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী দল গড়েছিলেন। অত্যাচারী ইংরেজ

রাজকর্মচারী এবং তাদের তাঁবেদারদের হত্যা করে শাসকগোষ্ঠীর মনে ভীতির সঞ্চার করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। অমরদের মতে অনেক কিশোর সে দলে যোগ দিয়েছিল।

সেটা খুব সম্ভবত একত্রিশ সাল। জেলা জজ স্টিফেন সাহেব নেত্রহাট হাইস্কুলের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী সভায় যোগ দিতে আসছিলেন। সঙ্গে দেহরক্ষীও ছিল। গেটে গাড়ী থেকে নেমে মঞ্চের দিকে যাচ্ছিলেন। ভিড়ের মধ্যে কারা দুদিক থেকে গুলি করে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। তখন সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে যুক্ত প্রায় সকলকেই গ্রেপ্তার করা হয়। দুদিন পরে কুসুমপুর থেকে অমর গ্রেপ্তার হয়। অপরাধে ব্যবহৃত রিভলবারটি তখনও নাকি তার কাছে ছিল। এমনকি ব্যবহৃত দুটি গুলির খাপও নাকি তার কাছে পাওয়া গিয়েছিল।

স্পেশাল ট্রাইবুনালে বিচার হল। বিচার তো তখন হত না। বিচারের নামে প্রহসন হত। প্রহসনে অমরের ফাঁসির হুকুম হল। জেলখানার ভিতবেই ফাঁসি দিতে পারত, কিন্তু স্থানীয় লোকদের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য ঐ প্রকাশ্য রাস্তার ওপর নিয়ে এসে বটগাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি কার্যকর করল।

'আচ্ছা তা না হয় করল', মুকুল জিজ্ঞেস করেছিল, 'কিন্তু অমর স্টিফেন সাহেবকে খুন করতে গেল কেন?'

বিধুবাবু উত্তর দিলেন, 'তিনি অনেক বিপ্লবীর ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন, তাই বিপ্লবীদের হিট-লিস্টে ছিলেন।'

'তা হলে তো তাঁর সাবধান থাকা উচিত ছিল!'

'সাবধান তো ছিলেন। সঙ্গে দেহরক্ষীও ছিল। কিন্তু যারা মরণকেও ভয় করে না—সাবধান হয়ে কেন, কোন ভাবেই তাদেরকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না!'

তিন

এই ব্যাপারটা ভেবে মুকুলের খুব ভাল লাগে যে, তাদের গ্রামে অন্তত এমন একজন ছেলেও ছিল যে মরণকেও ভয় পেত না। যে দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিল, কিন্তু দেশবাসীরা তার জন্য কিছু করেনি। একটা স্মৃতিস্তম্ভও গড়েনি। পূর্ত বিভাগের কোন সদাশয় অফিসারের উদ্যোগে যদি এই সাইনবোর্ডটা না টাঙানো হত, তা হলে হয়তো মুকুল তার গ্রামের এই বীরের কথা জানতেই পারত না।

মুকুল দেখেছে, কলকাতার বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে বিভিন্ন বিপ্লবীদের মূর্তি বসানো, সদর শহরেও আছে। কিন্তু কোথাও অমরের কোন মূর্তি বসেনি। অন্য কোথাও না হোক, নেত্রহাট কি পারুলডাঙ্গায় অন্তত অমরের একটা মূর্তি বসানো উচিত। স্টিফেনকে ঐ স্কুলের মাঠেই ইহলোক থেকে সরিয়ে দিয়েছিল, তা হলে স্কুল-প্রাঙ্গণে কেন অমরের একটা মূর্তি বসানো হবে না?

মুকুল স্কুলের বর্তমান শিক্ষক মহাদেব চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলেছিল। তিনি খুব আগ্রহের সঙ্গে মুকুলের কথা শুনেছিলেন। যথাসাধ্য করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। তা তিনি প্রতিশ্রুতি রেখেছেন। স্কুলের শিক্ষক সমিতি এবং ম্যানেজিং কমিটিকে দিয়ে প্রস্তাব পাশ করিয়ে সদরে পাঠিয়েছিলেন। তিনি স্থানীয় লাল পার্টির সঙ্গে যুক্ত। লাল পার্টির লোকাল কমিটিকে দিয়ে একটা প্রস্তাব পাশ করিয়ে জেলা নেতৃত্বের কাছে

পাঠিয়েছিলেন। তার অনুরোধে জেলা নেতৃত্ব রাজী হয়েছে।

ঠিক হয়েছে, স্কুল-প্রাঙ্গণেই অমরের আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করা হবে। বিখ্যাত ভাস্কর, চিন্তামণি কর্মকারকে শ্বেতপাথরের মূর্তি তৈরী করতে দেওয়া হয়েছিল। তৈরী হয়ে গেছে। ডিসেম্বরের বাইশ তারিখ অমরের পঁচাত্তরতম জন্মদিন পড়ছে। সেই প্লাটিনাম জয়ন্তীর দিনই তাঁর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হবে। আবরণ উন্মোচন করবেন মাননীয় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী, প্রভাত মুখার্জী। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী শ্যামল বসু। মুখার্জী নীল এবং বসু লাল পার্টির লোক। কাজেই উভয় পার্টির লোকেরাই সভায় যোগ দিতে উৎসাহী। নিমন্ত্রণও সকলকেই করা হয়েছে। মুকুলরা কয়েকজন মিলে সবার বাড়ী বাড়ী গিয়ে নিমন্ত্রণ করেছে। তাতে নরমপন্থী বিধুভূষণ দাশগুপ্ত যেমন নিমন্ত্রিত হয়েছেন, চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদী আন্দামান-ফেরত 'পাগলা বিলু'ও নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

চার

বিলু আসলে পাগল নন। তাঁর পুরো নাম বিপ্লব বিশ্বাস। তিনিও অমরের মত সন্ত্রাসবাদী দলের সদস্য ছিলেন। চাঁদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর দ্বীপান্তর হয়েছিল। আন্দামানের সেলুলার জেলে তাঁর ওপর যে অত্যাচার করা হয়েছিল তাতে তাঁর মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। দেশ স্বাধীন হলে তিনি ছাড়া পান। চিকিৎসার ফলে অনেকটা সুস্থও হয়ে ওঠেন, কিন্তু এখনও যেখানে-সেখানে যার-তার সামনে যা-তা বলে দেন। কথা বলার ব্যাপারে নাকি তাঁর কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। সেইজন্য লোকেরা তাঁর নামকরণ করেছে 'পাগলা বিলু'!

পাঁচ

একটি বর্গক্ষেত্রের তিনটি বাহুর ওপর স্কুলের দোতলা বাড়ী। দক্ষিণ বাহুর ওপর প্রাচীর। প্রাচীবের মাঝখানে গেট। গেট দিয়ে ঢুকলে বর্গাকার প্রাঙ্গণ। সেই প্রাঙ্গণের উত্তর প্রান্তে মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। মূর্তিকে ঘিরে মঞ্চ। মঞ্চের ওপর টেবিল-চেয়ার। টেবিলের ওপর টেবিল-ক্লথ। ফুলদানিতে সুগন্ধী ফুল। টেবিলের ওপারে মাঝখানে চেয়ারটিতে বসে অনুষ্ঠানের মধ্যমণি প্রভাত মুখার্জী। তাঁর পশ্চিমে প্রধান অতিথি শ্যামল বসু। তাঁর পাশে অনুষ্ঠানের সভাপতি, স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাদেব চক্রবর্তী। মুখার্জীর পূর্বে প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বিধুভূষণ দাশগুপ্ত।

একদম প্রথম সারির ডান দিকে অমরের দাদা এবং দিদির বংশধরদের বসানো হয়েছে। বাম দিকে প্রেসের লোকদেব। তার পরে আর সব লোক বসেছে। স্কুলের প্রাঙ্গণটা পুরো ভরে গেছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাল্যদান হয়ে গেছে। সভাপতি মহাশয় অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করছেন। মুকুল মহা আনন্দে এখনও যাঁরা আসছেন তাঁদের নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে গিয়ে বসাচ্ছে।

হঠাৎ দেখল, 'পাগলা বিলু' গেট দিয়ে ঢুকছেন। মুকুল ব্যস্ত হয়ে পড়ল, তাঁকে কোথায় বসানো যায়? মঞ্চে নিয়ে গিয়ে বসানো উচিত। অন্ততপক্ষে সামনের সারিতে।

মুকুল ছুটে এগিয়ে গেল। কিন্তু তাঁর পৌঁছানোর আগেই মাঠের মাঝখানের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তিনি বসে পড়লেন। মুকুল গিয়ে অনেক সাধাসাধি করল, 'চলুন বিশ্বাসবাবু, আপনি সামনে গিয়ে বসবেন!' তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না, 'না হে ছোকরা, আমি এখানেই বেশ আছি!'

সভাপতি মহাশয় ঘোষণা করলেন, 'একটু পরেই মূর্তির আবরণ উন্মোচন করবেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় শ্রীপ্রভাতকুমার মুখার্জী মহাশয়।'

'পাগলা বিলু'র ভ্রূ কুঁচকে উঠল। তিনি মুকুলকে হাতের ইশারায় ডাকলেন। সে কাছে গেলে তিনি তার দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, এই প্রভাত মুখার্জীর বাবার নাম কি রায়বাহাদুর প্রতাপকুমার মুখার্জী?'

মুকুল নিজেও তা জানে না। তবে সে হাল ছাড়ল না। বলল, 'দাঁড়ান, জেনে বলছি।'

সে তাড়াতাড়ি মঞ্চের পেছনদিকে চলে গেল। মহাদেববাবু বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বিধুবাবুকে জিজ্ঞেস কবল: বিধুবাবু ঘাড় নেড়ে জানালেন, 'হ্যাঁ।'

মুকুল কালবিলম্ব না করে এসে বলল, 'হ্যাঁ!'

ছয়

ততক্ষণে সভাপতির ভাষণ শেষ হয়েছে। তিনি ঘোষণা কবলেন, 'এবারে শহীদ অমর মণ্ডলের আবক্ষ মর্মর মূর্তিব আবরণ উন্মোচন করবেন মাননীয় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখার্জী মহাশয়।'

প্রভাত মুখার্জী চেয়াব ছেড়ে উঠে, পিছন ফিরে মূর্তিব মুখের ওপর পর্দাটা সরাতে যাচ্ছিলেন, 'পাগলা বিলু' অমনি চেয়ার ছেড়ে উঠে চিৎকাব করতে লাগলেন, 'না! এটা হতে পারে না, আমি থাকতে হতে দেব না!'

তিনি ছুটতে ছুটতে গিয়ে মঞ্চে উঠে পড়লেন। মূর্তিকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে চিৎকাব করতে লাগলেন, 'অমব আমাব বন্ধু ছিল। এ কাজে ওব অপমান হবে। ওব অপমান আমি দাঁড়িয়ে দেখতে পারিনে। দেখলে ও আমাকে স্বর্গে ঢুকতে দেবে না।'

নেত্রহাটের লোক তাঁর এরকম আচরণ দেখতে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু দুই মন্ত্রী আসায় বাইরের প্রচুব পুলিস এসেছিল। তারা ছুটে এসে মঞ্চ থেকে তাঁকে টেনে নামাল। তিনি চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'তোমরা তো পরাধীন পুলিস না. স্বাধীন দেশেব পুলিস—আমার কথা তো শোন!'

কিন্তু তারা তাঁর কথা শুনল না। তাঁকে গাড়ীতে তুলে থানায় পাঠিযে দিল।

সাত

'পাগলা বিলু'র আকস্মিক উৎপাতে সমগ্র সভাটা হকচকিয়ে গিয়েছিল। তাঁকে দূরে সরিয়ে দিতে আবার ধাতস্থ হল। মন্ত্রীদ্বয়কে আশ্বস্ত করে সভাপতি দুঃখপ্রকাশ কবে বললেন, 'সভা চলাকালীন এরকম উৎপাত ঘটায আমবা আন্তরিকভাবে দুঃখিত: কিন্তু

যিনি এই কাণ্ড করলেন, তিনিও একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। বিদেশী সরকারের পুলিসের অত্যাচারে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। কাজেই তিনি কি করলেন সেটা তিনি নিজেও জানেন না। দেশের প্রতি তাঁর ত্যাগের কথা ভেবে ব্যাপারটা আমাদের সহানুভূতির চোখে দেখতেই হবে।'

সভাপতির কথা শুনে মন্ত্রীরা আশ্বস্ত হলেন। প্রভাত মুখার্জী আবার উঠে দাঁড়ালেন। মূর্তির আবরণ উন্মোচন করে ভাষণ দিতে লাগলেন, 'শহীদ অমর মণ্ডল শুধু নেত্রহাটের নন, শুধু বাংলারও নন, তিনি সারা ভারতবর্ষের। আমাদের সকলের প্রেরণা স্বরূপ। ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রতীক। তাঁর মত লোকদের ত্যাগের মূল্যেই আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। দুঃখের বিষয়, আজকালকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই ত্যাগ ও তিতিক্ষার উদাহরণ খুব বেশী চোখে পড়ে না। তাদেরকে এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।'

ভাষণ চলতেই লাগল।

আট

মুকুলের খুবই খারাপ লাগছিল। দুর্ঘটনাটা কি না ঘটলেই চলছিল না? ঘটনাটার জন্য তার নিজেকেই দায়ী মনে হচ্ছিল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাবার নাম যে রায়বাহাদুর প্রতাপকুমার মুখার্জী সেটা তো সে-ই জেনে এসে জানিয়েছিল, কিন্তু সেটা জেনে তিনি অত ক্ষেপে গেলেন কেন?

পুলিসের লোকেরা ছুটে এসে তাঁকে ধরে ফেলল। মঞ্চ থেকে নামিয়ে আনল। এ পর্যন্ত তবুও ঠিক ছিল। কিন্তু ওরা থানায় পাঠিয়ে দিল। একজন 'পাগলা' লোককে থানায় পাঠানোর কি দরকার ছিল? 'পাগলা' লোকটাকে থানায় নিয়ে গিয়ে কি করল? মুকুলের মনে হল, ব্যাপারটা জানতে হবে।

অনুষ্ঠান শেষ হতেই সে থানায় ছুটল।

পৌঁছে দেখল, থানার লোকেরা তাঁকে হাজতে ঢোকায়নি। তবে আটকে রেখেছে। তিনি ছুটে বেরিয়ে আসতে চাইছেন আর থানার লোকেরা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আটকে রাখছে।

মুকুলকে দেখে তিনি আরও উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'বেটারা মূর্তি গড়ে বিপ্লবীদের অপমান করছিস! গুলামের বাচ্চা গুলামকে দিয়ে অপমান করাচ্ছিস!'

নয়

মুকুল কিছুই বুঝতে পারল না। কিছু বলতেও পারল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। তিনি চিৎকার করতে করতে এক সময় শান্ত হয়ে বসলেন।

তখন মুকুল শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি রায়বাহাদুরের নাম শুনে অত রেগে গেলেন কেন?'

'রাগব না কেন?' তিনি আবার চিৎকার করতে লাগলেন, 'রাগব না কেন? অমরের

মত ছেলেরা দেশের জন্য হাসিমুখে প্রাণ দিচ্ছে। আমরা দ্বীপান্তরে জেলে পচে পচে মরছি। নরকের কীট প্রতাপকুমার মুখার্জী তখন সাহেবদের গুলামী করে রায়বাহাদুর খেতাব পাচ্ছে! মহাত্মা গান্ধীর ডাকে বিধুভূষণের মত ছেলেরাও তখন স্কুল ছেড়ে আন্দোলনে যোগ দিয়েছে, দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক সাহেবদের পা-চাটা কুকুর নিজের ছেলেকে সাহেবদের দেশে রেখে পড়াচ্ছে। আর সেই স্বার্থপর কুকুরের বাচ্চাটাকে নিয়ে এসেছিস অমরের অপমান করতে?

'অমরের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছিল কে? সেই বিশ্বাসঘাতকটা! রিটায়াব করার পরও সাহেবদের সেবা করার জন্য স্পেশাল ট্রাইবুনালের জাজ হয়েছিল। আর হয়েই প্রভুদের কৃপাধন্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও ফাঁসির আদেশ দিয়েছিল। আর সেই ঘাতকের বাচ্চাকে এনেছিস অমবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে?'

মুকুল স্তম্ভিত হয়ে যায়। এ তো কোন পাগলের কথা নয়! এ তো একজন একনিষ্ঠ দেশভক্তের ক্ষোভের কথা! এই প্রেক্ষাপট জানা থাকলে মঞ্চের ওপর তাঁর কথাগুলোকেও অপ্রাসঙ্গিক বলা যায় না।

মুকুলের মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। কোন বকমে শুধু উচ্চারণ করল, 'আমি জানতাম না!'

'আমি তো বলতে চাচ্ছিলাম, তোরা বলতে দিলি না।' মুকুল তাঁর কথা বুঝতে পেরেছে দেখে তিনি অনেক শান্তভাবে কথা বলছিলেন, 'এই যে পুলিসের দল, এরা এখনও স্বাধীন দেশের পুলিস হয়ে ওঠেনি। তখন সাহেবদের গুলামী করত, এখন সাহেবদের গুলামদের গুলামী করছে!'

তাঁর এ কথা শুনে পুলিসের লোকেবা একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

মুকুল তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য বড়বাবুকে অনুরোধ করল। বড়বাবু বলল, 'হ্যাঁ, অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে। মন্ত্রীও রওনা হয়ে গেছেন। এবার ছেড়ে দিতে কোন অসুবিধা নেই।'

দশ

তাঁকে ছেড়ে দিল। মুকুলের দিকে একবার তাকিয়ে তিনি বাড়ীর দিকে হাঁটতে লাগলেন। মুকুল পাশে পাশে হাঁটছিল। তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'একবার তো থানায় দিলি, আবার কি মতলব?'

'আপনার দ্বীপান্তর কি করে হল, জানতে ইচ্ছে করছে!'

'দ্বীপান্তর কি করে হল? স্বপন শিকদারের "স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের দান" বইটা পড়েছিস? ওখানে পরিষ্কার লেখা আছে, স্টিফেনকে একসঙ্গে দুপাশ থেকে দুজন মাথা লক্ষ্য করে গুলি করেছিল। একজন তো ছিল অমর—আরেকজন কে? এই বিপ্লব বিশ্বাস!

'স্টিফেন লুটিয়ে পড়তেই পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে ছুট। পরিকল্পনা মত আমি গিয়ে আশ্রয় নিলাম বেনেখালির ফটিকদার বাড়ীতে। অমর গেল কুসুমপুরের কার্তিকদার

কাছে। কিন্তু ওখানে পুলিস আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। পুলিস পাশের গ্রামে গিয়েছিল। সেখানকার লোকেরা বুঝতে পারেনি। ডাকাত ভেবে পুলিসের হাতে তুলে দিয়েছিল।'

'কিন্তু আপনি তো ধরা পড়েননি! আপনার দ্বীপান্তর হল কি করে?'

'তাঁর জন্য তো প্রভাত মুখার্জীরা ছিল! ষড়যন্ত্র মামলা সাজাল, কোন প্রমাণ নেই—প্রমাণ তৈরী করে আন্দামান পাঠিয়ে দিল!'

মুকুল খানিকক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না। তারপর আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, 'আরও তো বিপ্লবী ছিল, তা স্টিফেনকে আপনারা দুজনেই খুন করতে গেলেন কেন?'

'ও যখন আলিপুর থেকে এখানে বদলি হয়ে এল তখন আমাদের ইউনিটের ওপরই ভারটা পড়ল। সুনীলদা কথাটা তুলতেই অমর সঙ্গে সঙ্গে ভলান্টিয়ার করল। আমারও ইচ্ছে ছিল, আমি ইচ্ছে প্রকাশ করাতে দুজনেব ওপরই ভার পড়ল।

'অমরকে তো ওরা ফাঁসি দিয়ে মেরে ফেলল। শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় পকেট থেকে একটা চিঠি পাওয়া গেল। জানিস, তাতে কি লেখা ছিল?'

'কি?'

'দ্যাখ!'

তিনি পকেট থেকে একটা প্লাস্টিকে মোড়া কাগজ বের করে মুকুলের হাতে দিলেন। মুকুল ভাঁজ খুলে শতছিন্ন কাগজটাকে প্লাস্টিকের ওপর দিয়েই পড়তে লাগল।

এগারো

'আমি দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলাম। এই ভেবে ভাল লাগছে যে, দেশের জন্যই যাচ্ছি। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের বলিস, তারা যেন আমার জন্য দুঃখ না করে। চিরদিন থাকার জন্য কেউ পৃথিবীতে আসে না। কেউ চিরদিন থাকেও না। আমি দুদিন আগে গেলাম। তারা দুদিন পরে যাবে। এর জন্য দুঃখ করার কোন মানে হয় না।

'আমার শুধু এই দুঃখ যে, আমাকে পরাধীন দেশেই মরতে হল। তোরা যারা থাকলি তারা জানি দেশমাতৃকাকে শৃঙ্খল-মুক্ত করবি। আমাদেব উত্তরপুরুষ যেন স্বাধীন দেশে স্বাধীনভাবে বাস করে। আর দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক, ইংরেজদের পা-চাটাদের কক্ষনও ক্ষমা করিস নে। বন্দে মাতরম!'

মুকুল এবার পরিষ্কার বুঝতে পারল, কেন প্রভাত মুখার্জীকে দেখে বিপ্লববাবু অত বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন? কিন্তু কেউ তার কথা শুনল না? হয়তো বুঝতেই পারল না!

আর কেউ না-ই বুঝতে পারে, কিন্তু বিধুবাবু? তাঁর তো না বোঝার কথা নয়! হয়তো বুঝেও না বোঝার ভান করলেন। সেটা-ই সুবিধাজনক!

মুকুল কাগজটা আগের মত ভাঁজ করে ফেরত দিল। বিপ্লববাবু যত্নসহকারে সেটাকে পকেটে ঢুকিয়ে বাড়ীর দিকে হাঁটতে থাকলেন। মুকুলও নিজের বাড়ী রওনা হল। কিন্তু একটা প্রশ্ন ঘুরেফিরে মনে আসতে লাগল।

বারো

প্রতাপ মুখার্জী সাহেবদের তাঁবেদার ক'াচারী ছিল। দেশের স্বার্থবিরোধী নিজের কাজের দ্বারা সাহেবদের সন্তুষ্ট করে সে রায়বাহাদুর হয়েছিল। দেশের আর সকল ছেলেমেয়েরা যখন স্কুল-কলেজ ছেড়ে স্বাধীনতাব জন্য জীবন পণ করে লড়াই করছিল, তার ছেলে তখন সাহেবদের দেশে গিয়ে নির্বিঘ্নে পড়াশোনা করছিল। দেশ যখন স্বাধীন হল, সেই ছেলেই দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা হল! আর অমর দেশেব স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবনটাই উৎসর্গ করলেন। স্বাধীন দেশে তাঁর কোন বংশধর থাকল না! আত্মীয়-স্বজনের বংশধর যারা থাকল তারা তার বাবার মতই খেটেখাওয়া মানুষ হয়ে থাকল। এ কি ধরনের স্বাধীনতা তারা পেল? অমব যদি আন্দোলনে : ে োগ দিয়ে পড়াশোনা করত, হয়তো একটা ভাল চাকরি পেত। সেই সূত্র ধরে ত.র বংশধরেরা উন্নতির পথে আরও খানিকটা এগিয়ে যেতে পারত। সে কি প্রাণের বিনিময়ে এই স্বাধীনতা চেয়েছিল যে, সাহেবরা চলে গেলেও সাহেবদের তাঁবেদাররা তাদের শাসন করবে? আর পুলিস? সেদিন বাবার হুকুমে বিপ্লবকে ধরেছিল। আজ ছেলের জন্যে? এই স্বাধীনতার জন্যই কি সে দ্বীপান্তরে গিয়েছিল?

ক্রিমিন্যালটার কথা শুনে মাথায় আগুন ধরে গেল। ওষুধ না দিলে পথে আসবে না! 'ওঝা ?'

'জি হুজুর!' দরজা ঠেলে ওঝা ঢুকল।

'একটা শক্ত দেখে লাঠি নিয়ে আয়।'

ওঝা একটা লাঠি বের করে পরীক্ষা করতে করতে এগিয়ে এল। বললাম, 'দে তো, পা আর পাছার ওপর গোটা কয় আচ্ছা করে দে। তারপর যা জিজ্ঞেস করার করব।'

ও কেয়ার না করে হেসে উঠল। ব্যঙ্গ করে বলল, 'বড়বাবু! কেন এত বাড়াবাড়ি করছেন স্যার? লম্ফঝম্প যতই করুন, আপনি তো ভালভাবেই জানেন স্যার, আমার গায়ে আপনি একটা আঁচড় দিতে পারবেন না!

'হিউম্যান রাইটস কমিশনে একটা পিটিশান করে দিলেই দলবলসুদ্ধ আপনি আসামী! তদন্ত, টি আই প্যারেড, কোর্টের কাঠগড়া, জেলও হতে পারে! আমি পালিয়ে থাকতে পারব, আপনি ঘর-সংসার আত্মীয়-স্বজন সরকারী চাকরি ছেড়ে পালাতে পারবেন স্যার?'

'আমি পালাতে পারব কি না, সে তো পরের কথা। তোকে তো কোর্টে প্রমাণ করতে হবে। সাক্ষী কে দেবে?'

'আপনাদের লোকেরাই দিবে স্যার। একে অপরের পাছায় কাঠি দিতে পুলিসের লোকেরা ওস্তাদ। যে ওঝা এখন বিষ ঝাড়তে আসছে, সেই তখন সাপ হয়ে দংশাবে!'

কিছু বলার ছিল না। লজ্জা এড়াতে দৃষ্টি ফেরালাম। ওঝাও অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। চোখে চোখ পড়তে, বোধহয় লজ্জা পেল। বেরিয়ে গেল। আরও বিব্রত বোধ করলাম। অস্বস্তি এড়াতে প্রসঙ্গ পাল্টালাম, 'ঠিক আছে, তোর সঙ্গে কেউ ছিল না! তুই তো ছিলি?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'খুন করেছিস?'

'করেছি স্যার।'

'তা হলে একা একাই ফাঁসিকাঠে যা।'

'আগে কোর্টে প্রমাণ হোক স্যার!'

'তুই তো বলছিস?'

'সে তো আপনার কাছে বলছি স্যার, কোর্টে বলব না।'

'কেন?'

'পুলিসের কাছে স্বীকারোক্তি তো কোর্টে গ্রাহ্য হবে না স্যার। আর আপনাদের সাক্ষীপ্রমাণ যোগাড় করে কোর্টে পেশ করা পর্যন্ত অনেক ধাপ। একটা ম্যানেজ করতে পারলেই স্লিপ করে বেরিয়ে যাব।'

'কিরকম?'

'ধরুন স্যার, যে ডাক্তারবাবু পোস্টমর্টেম করবে সে যদি বলে দেয় যে এটা হত্যা নয়—আত্মহত্যা, তাহলেই আমার বিরুদ্ধে কোন কেস নেই।'

'মার্ডারটা না হয় নেই, ফোর্জারিটা?'

'ঐ একই ব্যাপার স্যার। ডাক্তারের জায়গায় শুধু হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্ট। আপনি তো বছরখানেক আগে পাঠিয়েছেন। কয়েকবার রিমাইন্ডারও দিয়েছেন। রিপোর্ট এসেছে স্যার? আসবে না। ডাক্তারের রিপোর্টও ঐরকমই হবে।'

'সে গুড়ে বালি! ডাক্তার রিপোর্ট দিয়ে দিয়েছে, ক্লিয়ার কেস অফ হোমিসাইড। ডেথ ইজ ডিউ টু...'

'...বুলেট ইনজুরি অ্যান্টে মর্টম ইন নেচার। হলেও স্যার, আপনাব আই ও যদি তদন্ত করে বলে দেয় যে. ঐ হত্যার সঙ্গে আমার কোন যোগ নাই. তা হলেই মিটে গেল!'

'সে আশাও করিস? গোঁফে তেল দিয়ে বসে থাক, আমি থাকতে সেটি হচ্ছে না।'

'জানি স্যাব, কিন্তু আপনিও তো না থাকতে পারেন!'

'কেন? তুই আবার আমাদের বদলিও করছিস নাকি?'

'আমি বদলি করব কেন স্যার? আপনারা তো এক জায়গায় বেশী দিন থাকেন না। আপনার এখানে হয়েও গেছে বছর দুয়েক। দাদাদেরও তেল মারেন না যে, তারা আপনাকে আরও কিছুদিন রাখার জন্য সুপারিশ করবে! যে কোন দিন বদলি হতে পারেন!'

'পারি, কিন্তু তাতে তোর কিছু সুবিধা হবে না। বদলি হলেও তোর বিরুদ্ধে চার্জশিটটা দিয়ে তবে আমি ডিপার্চার নেব।'

'সে সুযোগ আপনার থাকলে তো স্যার! তার জন্য হাইকোর্ট আছে। সেরকম একজন উকিল ধরে জজসাহেবকে সন্তুষ্ট করতে পারলেই কেস কোয়াশড। অন্ততপক্ষে একটা ইন্টারিম স্টে অর্ডার! ইনভেস্টিগেশান স্টপ! আর একবার স্টে অর্ডার হলে অর্ডারের জন্য আর পুট আপ হবেই না স্যার। ডকেটই হাপিস হয়ে যাবে।

'তার পরেও যদি কোনদিন চার্জশিট হয়, অন্য ধাপগুলো ধবতে হবে স্যার। আলাদিনের প্রদীপের নয়, অশোক স্তম্ভ মার্কা নোটেব আশ্চর্য কেরামতিতে অসম্ভব সব সম্ভব হয়ে যাবে! সময়মত কপি সার্ভ হবে না। শুনানির দিন ঠিক হবে না। হলেও সাক্ষী পাওয়া যাবে না। পাওয়া গেলেও পি.পি.-রা যা করবে তাতে আপনাদের থেকে আমার সুবিধা হবে বেশী। তাও না হলে জজসাহেবকে ধরতে হবে। তাতেও সুবিধা না হলে আবার আছে হাইকোর্ট। আবার কোয়াশের প্রার্থনা। তারপর রিট। তারপর রিভিসান। আমার জীবৎকালে ট্রায়াল শুরু হবে না স্যার।'

মনে হল, যা বলছে. সম্ভব। হচ্ছেও। জোর করেই বললাম, 'তুই যা বলবি, লোকগুলো তাই করবে? ওরা কি তোর কেনা গোলাম?'

ও হাতে তুড়ি মেরেই উড়িয়ে দিল, 'গোলাম হবে কেন স্যার? স্বভাবে কুকুর! শুধু ফাঁকা আওয়াজ! এক টুকরো মাংস তুলে ধরলেই সব ঘেউ ঘেউ বন্ধ! লেজ নাড়বে আর কুঁই কুঁই করবে! পকেটে কয়েকটা নোট গুঁজে দিলেই পূর্বাপর ভুলে গিয়ে পা চাটতে শুরু করবে!

'আমাদের যে গয়নাগুলো আছে তা দশ-এগার ভরি হবে।'

'বেচলে পঞ্চাশ হাজার হবে। আর পঞ্চাশ হাজার?'

'তোর দিদিমার যে জমিটা আমার ভাগে পড়েছে, সেটা বেচলে বোধহয় হয়ে যাবে।'

আমারও মনে হল, হয়ে যাবে। কার্ডের ঠিকানা দেখে প্রোমোটার চয়ন ঝুনঝুনওয়ালার অফিসে পৌঁছে গেলাম। ও সাদরে আহ্বান জানাল, 'আসুন আসুন, বসুন। আপনি তা হলে আসিয়ে গেছে! কি, রুপেয়া লেকে আসিয়েছে?'

'না, ফ্ল্যাটটা কোথায়? মা একবার দেখতে যাবেন।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়। আপ কোঠর খরিদবে, জরুর দেখবে। কাল শুভে আসেন। হাম লিয়ে যাবে।'

পরের দিন ঝুনঝুনওয়ালা তার গাড়ীতে করে আমাদের একটা কন্সট্রাকশান সাইটে নিয়ে গেল। দেখলাম, মাটির ওপর কয়েকটা থাম মাত্র গাঁথা হয়েছে। বললাম, 'এখনও বাড়ীর তো কিছুই হয়নি!'

'হোয়ে যাবে।'

'কবে হবে?'

'বিশ-পঁচিশ দিনেই হোয়ে যাবে। কামকা স্পিড তো দেখছেন। উসকা আগে ভি হোবে।'

'তা হলে আমরা তখন টাকা দেব।'

'তখন ফিলাট থাকলে তো রুপেয়া দেবেন! বহুত কাস্টমার আছে। যো আগে দেবে ও পাবে। আপনি লেবে তো আভি দেবেন।'

কিছু না দেখে তখনই টাকা দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না। মা শুনল না, বলল, 'এরকম সুযোগ বারবার আসে না। দেরী করলে অন্য কেউ নিয়ে নেবে। তুই কালই বলে দে, আমরা নেব। আর কিছু না হোক, এই বারবার বাড়ী খোঁজার আতঙ্ক থেকে তো রেহাই পাওয়া যাবে।'

রাজী হয়ে গেলাম। মার গয়না আর জমি বেচা এক লাখ টাকা নিয়ে গেলাম। ঝুনঝুনওয়ালা নিয়ে রসিদ লিখে দিল। এগ্রিমেন্ট টাইপ করাই ছিল, সই করে একটা কপি দিল।

খুশী মনে বাড়ী ফিরে এলাম। বিশ-পঁচিশ দিন পরে নিজেদের বাড়ী হবে। প্রায় প্রতিদিন খবর নিতে লাগলাম।

বিশ-পঁচিশ দিনে হল না। ঝুনঝুনওয়ালা বলল, 'আপনি তো দেখছেন, কাম হোচ্ছে। হোয়ে যাবে।'

এই করে আরও পাঁচ মাস কাটল। বাড়ীওয়ালা তারিণী সেন তাড়া দিয়ে বলল, 'ছ মাসের মধ্যে ছেড়ে দেবে বলেছিলে, ছ মাস হয়ে গেছে—এখনও ছাড়ছ না, এটা কি ঠিক করছ?'

'জেঠু, ছেড়ে দেব বলেই আমাদের সর্বস্ব বিক্রি করে ফ্ল্যাট বুক করেছি। পঁচিশ দিনের মধ্যে পজেশান দেওয়ার কথা, পাঁচ মাস পরেও দিচ্ছে না, কি করব বলুন?'

'কি করবে সেটা তোমার ব্যাপার। ভালয় ভালয় আমার বাড়ী ছেড়ে দাও, না হলে আমাকে অন্য পথ দেখতে হবে।'

বাড়ীওয়ালা কথাগুলো রীতিমত শাসিয়েই বলল।

বাড়ীওয়ালা তারিণী সেনের তাড়া খেয়ে ফ্ল্যাটওয়ালা ঝুনঝুনওয়ালার কাছে গেলাম। ঝুনঝুনওয়ালা অমায়িক হেসে বলল, 'হামি তো দিয়ে দিত, এ শালা কন্ট্রাক্টর লোগ গোলমাল করল। নতুন কন্ট্রাক্টর লাগল—আপনি কুছু চিন্তা করবে না। আওর কুছু দিনে হোয়ে যাবে।'

হল না। আরও দু মাস কেটে গেল। এক রাতে বাড়ী ফিরে দেখলাম, বাড়ীওয়ালার লোকজন আমাদের জিনিষপত্র বের করে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। মা সেগুলো আগলে বসে বসে কাঁদছে। আমি ছুটে কোম্পানীর গ্যারেজে এলাম, মালিক যোগিন্দার সিং বলল, 'তা আমি কি করব, থানায় যা।'

গেলাম। থানাদার বলল, 'তোরা যে ভাড়াটে তার প্রমাণ আছে?'

'আছে।' আমি রসিদগুলো বের করে দিলাম।

সে দেখে নিয়ে বলল, 'এ তো অনেক পুরানো। কারেন্ট রসিদ আছে?'

'উনি তো গত ন'মাস ভাড়া নেননি।'

'উনি না নিলে রেন্ট কন্ট্রোলে জমা দিতে পারতিস! দিয়েছিস?'

'না!'

'তা হলে আমাদের কিছু কবার নেই!'

নিরুপায় হয়ে আবার গ্যারেজে ছুটলাম। দুয়েকজন বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে মাকে নিয়ে গ্যারেজে উঠলাম। পরের দিন প্রোমোটারের কাছে গেলাম।

প্রোমোটার বলল, 'কি করবে বাতাইয়ে! হাম তো দিয়ে দিত, জমিনওয়ালা কেশ করে দিল। হামিও ছাড়বে না। ক্লিয়ার হোয়ে যাবে। আপনি ফিলাট পাইয়ে যাবে।'

'কিন্তু ততদিন আমরা থাকব কোথায়?'

'এই বাত আছে? উসকাভি বন্দোবস্ত হোয়ে যাবে!'

হয়ে গেল। পাশের বস্তিতে একটা ঘর ভাড়া করে দিল। মন্দের ভাল। গ্যারেজে পড়ে থাকতে হল না।

আরও চার মাস কাটল। একদিন ষণ্ডাগণ্ডা মার্কা একজন লোক এসে চোটপাট শুরু করল, 'আবে শালা, শুনতে পাচ্ছিস না নাকি? এক মাস বলে তো এনে তুলল, চার মাস হয়ে গেল, ওঠার কোন নাম নেই! শিকড় গজিয়ে গেছে? আজ সন্ধ্যার মধ্যে দফা না হলে রাতের বেলা টান মেরে সব উপড়ে ফেলে দেব, মনে থাকে যেন।'

কিছু বললাম না, রেন্ট কন্ট্রোলে গিয়ে ভাড়াটা জমা দিয়ে ঝুনঝুনওয়ালার কাছে গেলাম। ঝুনঝুনওয়ালার ঝুমঝুমির মত একই বুলি, 'হোয়ে যাবে।

'আর কত দিনে?'

'সে কি কোরে বোলবে? যব কেস ডিসমিস হোবে, ফিলাট হোবে—তব পাইয়ে যাবে।'

'আমি আর ফ্ল্যাট নেব না, আমার টাকা ফেরত দিন।'

'বহুত আচ্ছা! আপ কাল আইয়ে, রুপেয়া মিল যায়েগা।'

পরের দিন গেলাম। লাখ টাকার একটা চেক বের করে আমাকে দিল। ব্যাঙ্কে জমা দিলাম। ফেরত হল। সই মিলছে না। গেলাম। নতুন করে সই করে দিল। জমা দিলাম। আবার ফেরত হল। টাকা নাই।

মালিক আবার বলল, 'থানায় যা।'

আমার থানার ওপর কোন ভরসা ছিল না, তবুও গেলাম। থানাদার ভাল করে না শুনেই বলে দিল, 'এ সব ননকগ সিভিল কেস, পুলিসের কিছু করার নেই—কোর্টে যা।'

গেলাম। বাড়ীওয়ালা, প্রোমোটার দুজনের নামেই কেস করলাম। সে কেস আজ দশ বছর পরেও একই রকম চলছে। ডেট পড়ছে। উকিল পয়সা নিচ্ছে। আবার ডেট পড়ছে। এই কেস চালাতে গিয়েই বুঝলাম, আমাদের দেশে বাদী-ফরিয়াদী হয়ে কোর্টে যাওয়ার থেকে প্রতিবাদী-আসামী হয়ে যাওয়াই সুবিধাজনক। তবুও একটা সঙ্কোচ ছিল, একদিন তাও কেটে গেল।

সেদিন ফেরার সময় ড্রাইভার বলল, 'আজ রাতমে একঠো ট্রিপ হ্যায়। বোলতা হ্যায়, বহুত রুপেয়া মিলেগা—যায়েগা?'

টাকাব কথা শুনে লোভ হল। টাকাব খুব দরকার ছিল। বাড়ীভাড়া, মামলার খরচ তো ছিলই, এরই মধ্যে পাশের গলির একটি মেয়ের সঙ্গে কদিন হল আলাপ হয়েছে। রানী—পনের-ষোল বছর বয়স। ছিপছিপে গড়ন। শ্যামলা বরণ। মসৃণ ত্বক। লম্বা চুল। টানা টানা চোখ। মায়াবী মুখ। রানী এত কাছে টানত যে, আমি দিশেহারা বোধ করতাম। ও ফুচকা খেতে আর সিনেমা দেখতে ভালবাসত। ওর জন্য তো মার কাছে পয়সা চাওয়া যায় না, উপরি হলে ভালই। আমি রাজী হয়ে গেলাম।

চৌমাথার মোড় থেকে ছ-সাতজন লোক উঠল। বিবিবাজারের কাছে একটা লরির পাশে এসে থেমে গেল। লোকগুলো নেমে ঐ লরি থেকে মালের বাণ্ডিল আমাদের লরিতে টপাটপ তুলে ফেলছিল, হঠাৎ ওদিক থেকে একটা গাড়ীর আলো দেখা গেল। আকাশে বাজ দেখলে যেমন শিকারী বেজির দল মুহূর্তে মাটির গর্তে মিলিয়ে যায়, রাস্তায় গাড়ী দেখে পুরো দলটা অলিতে-গলিতে মিলিয়ে গেল। পুলিস এসে ধরল আমাকে।

আমি অনেক করে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, 'আমি জানতাম না, ডাকাতি করতে নিয়ে আসছে—আমি এই প্রথম এসেছি।' পিঠে কয়েক ডাণ্ডা দিয়ে ব্যঙ্গ করে বলল, 'ধরা পড়লে ওরকম সবাই বলে, আমি কিছু জানি নে। এই প্রথম এসেছি।' ও সব নক্সা ছেড়ে তাড়াতাড়ি বল, আর কে কে ছিল, নাহলে ঝুলাবো।' যেই না বলা একজন লোক এসে পায়ে দড়ি বেঁধে মাথাটা নীচের দিকে করে তার থেকে ঝুলিয়ে দিল। আরেকজন এসে দমাদম পেটাতে লাগল। পিটুনির চোটে যারা ছিল না তাদের নামও বলতে বাধ্য হলাম। দুদিন পরে কোর্টে পাঠাল। কোর্ট থেকে আবার হাজতে। হাজত থেকে জেলে।

জেলের মধ্যেই খবর পেলাম, বাড়ীওয়ালার ষণ্ডাগণ্ডা-মার্কা লোকটা মাকে উচ্ছেদ করে দিয়েছে। মা থানায় ডায়েরী করতে গিয়েছিল, ডায়েরী নেয়নি। হঠাৎ কলোনীর

পটলারা দয়া করে ওদের বারান্দায় থাকতে দিয়েছে। মামলা চলছিল। মা উকিলের ফি দিতে না পারায় আমাদের উকিল নাকি মামলা ছেড়ে দিয়েছে। মা একদিন দেখা করতে এসে কান্নায় ভেঙে পড়ল। সেদিনই শপথ করেছিলাম, জেল থেকে ছাড়া পেলে আমি এর প্রতিশোধ নেব।

পাক্কা পাঁচ বছর সাজা হলেও জেলে ভালভাবে থাকার জন্য কিছুদিন আগেই ছাড়া পেলাম। মার খবর তো জানাই ছিল, রানীর খোঁজে সোজা ঐ গলিতে গেলাম। খবর পেলাম, শুঁড়ি লেনের গোবরা মস্তান ওকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। কেউ কেউ বলল, না, উঠিয়ে নয়, ও ইচ্ছে করেই গোবরার সঙ্গে ভেগে গেছে। আমার রক্তে জ্বালা ধরে গেল।

উকিল বিপদভঞ্জন অধিকারীর কাছে গেলাম। সে বলল, 'কি করব বল? আমি তো এই করেই খাই। দিনের পর দিন ফিজ না পেলে অন্য মক্কেল ধরতেই হয়।' ইচ্ছে করছিল, গালে এক থাপ্পড় কষাই, আমাদের কত ফিজ খেয়েছ, আর দুটো দিন মামলা লড়লে আমি ফিজটা এখন দিয়ে দিতাম না। আসলে ওদের থেকেও খেয়েছ!

বুকের কথা বুকে নিয়েই বসেছিলাম। উকিলের কি মনে হল জানি না, বলে ফেলল, 'আর উচ্ছেদের অর্ডার কোর্ট থেকে হয়নি। ওরা যে অর্ডার দেখিয়ে উচ্ছেদ করেছে, সেটা জালিয়াতি। তুই মামলা করলে ওদের সাজা হয়ে যাবে।'

'তার জন্য জাল অর্ডারের কপিটা তো চাই। কোর্টে অর্ডার হয়নি, কোর্ট থেকে পাওয়া যাবে না।'

উকিল বলল, 'পুলিস হেল্পের জন্য থানায় একটা কপি দিয়েছিল, চেষ্টা করে দেখতে পারিস।'

চেষ্টা করতে গেলাম। থানেদারবাবু ফুঁ দিয়েই উড়িয়ে দিল, 'ওরকম কোন অর্ডারের কথা আমরা শুনিনি, কেউ কপিও দেয়নি।'

'তা হলে মাকে উচ্ছেদ করে দিলেন কোন অর্ডারে?'

লাল খাতাটা উল্টেপাল্টে দেখে বলল, 'আমরা উচ্ছেদ করেছি, সেরকম কোন রেকর্ড নেই।'

গ্যারেজে গেলাম। মালিক কিছু বলার আগেই সেই ড্রাইভার ভাগিয়ে দিল, 'তেরে সাথ কৈ বাৎ নেহি। ঝুট বোলকে হাম সবকো ফাঁসা দিয়া। ভাগ ইঁহা-সে!'

যেখানে গেলাম সেখান থেকেই এরকম ভাগিয়ে দিল।

তিন

'দুনিয়ায় সব আছে। অনেকের অনেক বেশী বেশী করে আছে। আমার কিছু নেই। থাকার একটু জায়গা নেই। খাবার একটা পয়সা নেই। পয়সা রোজগার করার সুযোগ নেই। ভালভাবে থাকতে বলছিলেন না স্যার, কি নিয়ে ভাল থাকব? কোথায় ভাল থাকব? ভাল থাকলে আমার কিচ্ছু নেই!

'কেন, তোর মা তো ছিল!'

পটলারা দয়া করে বারান্দায় থাকতে দিয়েছিল বলে ছিল। গলগ্রহেরও গলগ্রহ হয়ে থাকা সম্ভব ছিল না। হাতেখড়ি না জানতেই হয়ে গিয়েছিল। পাড়ার কয়েকটা ছেলেকে নিয়ে দল করলাম। একদিন ঐ বাড়ীতে জোর করে ঢুকে গেলাম।

এবার পুলিসের তৎপরতা দেখার মত। সঙ্গে সঙ্গে হাজির। সবার আগে সেই থানাদারবাবু, এসেই হম্বিতম্বি, 'আমার এলাকায় রংবাজি চলবে না। মেরে হাত-পা ভেঙে দেব।'

ডাণ্ডা মারে আর কি! আমি বললাম, 'আরে আরে, কি করেন, কি করেন? যা করবেন করুন, কিন্তু আমাকে বলুন, আমার অপরাধটা কি?'

'হারামজাদা! বুঝতে পারছিস না, অপরাধটা কি? ভরদুপুরে ভদ্দরলোকের বাড়ীতে হামলা করে আবার ন্যাকামি হচ্ছে?'

সজোরে পিঠের ওপর এক লাঠি পড়ল। মেজাজ যথাসম্ভব ঠাণ্ডা রেখে আমি বললাম, 'থানাদারবাবু, আমরা এ বাড়ীতে কয়েক বছর যাবৎ ভাড়া আছি।' আমি পকেট থেকে ভাড়ার রসিদগুলো বের করে দিলাম।

থানেদারবাবু সেগুলো পরীক্ষা করতে করতে বলল, 'কিন্তু ওরা যে বলছে, তোরা পাঁচ বছর বাড়ীছাড়া!'

'আসলে স্যার, পাঁচ বছর ধরে উনারা উচ্ছেদ করতে চাইছেন, ভাড়া নিচ্ছেন না, তবু আমরা ভাড়া বাকী রাখিনি, রেন্ট কন্ট্রোলে জমা দিয়েছি।'

রেন্ট কন্ট্রোলের রসিদগুলো পরীক্ষা করতে করতে বড়বাবু বলল, 'ওরা যে বলছে, তোদের বিরুদ্ধে কোর্টের উচ্ছেদের অর্ডার আছে!'

'একটা কপি আমাকে দিতে বলুন স্যার, আমি এক্ষুনি ঘর ছেড়ে চলে যাব।'

'তা হলে তো মিটেই গেল। প্রমোদবাবু, অর্ডারের একটা কপি দিয়ে দিন, ওরা বেরিয়ে যাক।'

প্রমোদবাবু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এঘর ওঘর অনেক ঘোরাঘুরি করার পর এসে জানালেন, 'না বড়বাবু, কোথায় রেখেছি; কিছুতেই পাচ্ছি না।'

আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'অর্ডারই হয়নি তো পাবেন কি করে? বরং আমাদের একটা হান্ড্রেড ফর্টি ফোর অর্ডার আছে।' আমি কপিটা বের করে দিলাম।

থানাদারবাবু সেটার ওপর চোখ বুলিয়ে চমকে উঠলেন, 'কি প্রমোদবাবু, এ যে সব উল্টো দেখছি! আমাদের কি আপনি জেল খাটাবার মতলব করেছেন নাকি?' প্রমোদবাবু দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে থাকল। থানাদারবাবু নিজের লোকদের উদ্দেশ করে বললেন, 'চলরে চল, শুধু শুধু সময় নষ্ট!'

চার

থানাদারকে জব্দ করার কথা বলে গণেশ মিচকি মিচকি হাসতে লাগল। জিজ্ঞেস করল, 'জাল অর্ডারের রহস্য ভেদ করে বাড়ীতে ঢুকে গেলি বুঝলাম, কিন্তু একশো চুয়াল্লিশ ধারার অর্ডার কি করে পেলি?'

'আপনি তো জানেন স্যার, পয়সা থাকলে কোর্টে সব পাওয়া যায়। পানের দোকানে

যেমন বিড়ি বিক্রি হয়, কোর্ট-চত্বরে তেমনি অর্ডার বিক্রি হয়। পকেটে পয়সা থাকলে যেরকম অর্ডার চান পাবেন!'

'কিন্তু একটা পিটিশান তো ফাইল করতে হবে, ডেট ফিক্সড হতে হবে, থানা থেকে রিপোর্ট আসতে হবে!'

'পয়সা ফেললে সব একদিনে চলে আসবে স্যার। ব্যাকডেটেও আসবে। আমি তো তারক মুহুরির হাতে পাঁচ হাজার টাকা ধরিয়ে দিলাম, পরের দিন অর্ডারের কপি দিয়ে দিল।'

'জালিয়াতিটা তুই করেছিস, সেটা স্বীকার করতে চাইছিস না?'

'না স্যার, সত্যিকার যা ঘটেছে তাই বলেছি।'

'ঠিক আছে। ফোর্জারিটা হল, মার্ডারটা?'

'আপনাকে তো বললাম স্যার, তাকে তাকে ছিলাম, সেদিন সাইটে আসতেই কলার চেপে ধরে ঘুপচি ঘরটায় ঢোকালাম। বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে হাতে সেল ফোন ধরিয়ে দিলাম। মিছে কথা, মাপা হাসি হারিয়ে গেল। হাত এত কাঁপতে লাগল যে ফোনটা পড়ে গেল। শেষে আমাকেই লাইনটা ধরে দিতে হল। কি বলতে হবে তাও বলে দিলাম। আধঘন্টার মধ্যে টাকাভর্তি ব্যাগ চলে এল।'

'টাকা তো পেয়ে গেলি, তা হলে আবার মারলি কেন?'

'আমার ইচ্ছে ছিল না স্যার, কিন্তু মনে হল, বেঁচে থাকলে আরও অনেকের লাইফ হেল করে দেবে—ওর মরাই ভাল।

'স্যার, আমাকে তো আপনি অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন, আপনাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'কর।'

'আজ ওদের অভিযোগে আমাকে ধরে এত কথা জিজ্ঞেস করছেন, আমি তো ওদের বিরুদ্ধে কোর্টে গিয়েছিলাম, তারও আগে থানায়—আপনারা ওকে ডেকে একটা কথা জিজ্ঞেস করলেন না কেন, তুমি তো টাকা নিয়েছ, তাহলে টাকা ফেরত দিচ্ছ না, ফ্ল্যাটও দিচ্ছ না কেন?'

আমি আর কিছু বলতে পারলাম না। বোঝার চেষ্টা করতে লাগলাম, কাঠগড়ায় কারা দাঁড়িয়ে আছে, গণশারা না আমরা?
